KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No.: KLMLGK 2007	Place of Publication: ৫৪ সার্কিস 6ষ্ঠ অ্যাভেনিউ, কল-১৬
Collection: KLMLGK	Publisher: নীড় প্রকাশন
Title: [illegible]	Size: 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number: ৪৭/৯ ৪৭/১০ ৪৭/১২	Year of Publication: পৌষ ১৩৯৫ // Jan 1989 মাঘ ১৩৯৫ // Feb 1989 চৈত্র ১৩৯৫ // April 1989
	Condition: Brittle Good
Editor: [illegible]	Remarks:

C.D. Roll No.: KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৪৯ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা এপ্রিল ১৯৮৯

পেরেস্‌ত্রৈকা গ্লাস্‌নস্‌ত নিয়ে তোলপাড় সোভিয়েত দেশে সম্প্রতি সফর শেষ করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অধ্যাপক জয়ন্ত রায়ের দীর্ঘ প্রতিবেদন "সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজবাদের পুনর্বীকরণ"।

স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষদিকে শ্রমজীবী মানুষের উত্তাল সংগ্রামের ফলে জাতীয় স্তরে উন্মোচিত একটি বাম বিকল্পের সম্ভাবনা যেভাবে ১৯৪৫-৪৭ এই কালপর্বের মধ্যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল অধ্যাপক সুনীল সেন এবার বিশ্লেষণ করেছেন সেইসব ঐতিহাসিক তথ্য।

ঝাড়খন্ডী আন্দোলনের অন্যতম প্রবল শরীক মুন্ডা সম্প্রদায় স্বাধীন মুন্ডারাজ্য প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র লড়াই লড়েছিল ৯০ বছর আগে। সেই সংগ্রামের নেতা বীরসা মুন্ডার বিস্ময়কর রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির তথ্যসমৃদ্ধ পরিচয় তুলে ধরেছেন অধ্যাপক বিনয় চৌধুরী।

একটি গ্রন্থ নিয়ে আলোচনার সূত্র ধরে সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে মার্কসীয় উৎপাদন পদ্ধতির প্রত্যয় অপরিহার্য কিনা এই নিয়ে দুই মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ অশোক রুদ্র এবং অজিত রায়ের ভিন্নমত।

সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বীজবপনের আদৎ জায়গা মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাসের পাঠক্রম এবং অন্ততঃ কুড়িজন পাঠ্যপুস্তক প্রণেতার দৃষ্টিভঙ্গির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করেছেন গবেষণাধর্মী লেখক খাজিম আহমেদ।

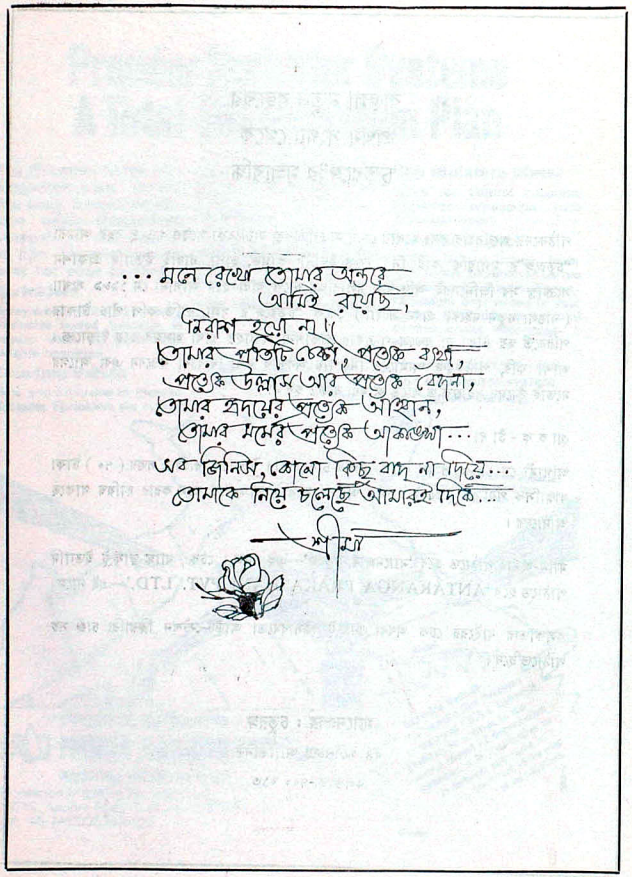

বর্ষ ৪৭। সংখ্যা ১২
এপ্রিল ১৯৮৯
চৈত্র ১৩৯৫

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২১-৬৩২১

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজবাদের পুনর্নবীকরণ

জয়ন্তকুমার রায়

১৯৮৫ সাল থেকে সোভিয়েত দেশে সমাজবাদের পুনর্নবীকরণ বিষয়টি নানা-ভাবে আলোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ রুশ থেকে অন্যান্য ভাষাতে গৃহীত হয়েছে। দুটি শব্দ—পেরেসত্রোইকা এবং গ্লাসনসত—বহুলপ্রচলিত। তৃতীয় একটি শব্দ সমান গুরুত্বপূর্ণ হলেও ততটা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি—সেটি হল খোজরাশচট। এই প্রবন্ধে আমরা পরে লক্ষ করব যে, খোজরাশচট হল পেরেসত্রোইকা আর গ্লাসনসত-এর মধ্যে সেতুস্বরূপ। এই তিনটি শব্দের কোনোটিরই পুরোপুরি সঠিক বাঙলা করা সম্ভব নয়। মোটামুটিভাবে পেরেসত্রোইকার অর্থ পুনর্গঠন, গ্লাসনসত-এর অর্থ মুক্ত-মতবিনিময় বা গণতন্ত্রীকরণ, এবং খোজরাশচট-এর মানে আর্থিক স্বয়ম্ভরতা বা স্বশাসন—এগুলি ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বর্তমান ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজবাদের পুনর্নবীকরণ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব নয়; এই জটিল এবং সুবিস্তীর্ণ বিষয়ের মাত্র কয়েকটি অংশ নিয়েই আলোচনা করা যেতে পারে। আলোচনায় সুবিধার জন্য পুনর্নবীকরণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক-প্রশাসনিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক—এই তিনটি দিকের পৃথক বিশ্লেষণ দেওয়ার চেষ্টা করা হবে, যদিও এই তিনটি দিক যে পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়, সেটাও মনে রাখা দরকার, এবং আলোচনায়ও সেটা হয়ে উঠবে পরিষ্কার।

এক

প্রথমত, অর্থনৈতিক দিক। সমাজবাদের পুনরুজ্জীবনের একটি মৌলিক ধারণা হল, সমাজবাদ জনগণের সেবার জন্য। সাধারণ মানুষকে জড় পদার্থ হিসাবে গণ্য করে তাকে কাল্পনিক সমাজবাদের দাস ভাবা চলবে না। জনগণের প্রত্যেকেই সজীব ব্যক্তি; তাঁদের শুধুমাত্র আদেশ পালনের মূক-যন্ত্র বলে ধরা যাবে না; এমনকী ওই আদেশ যদি কোনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অজুহাতে দেওয়া হয়, তাহলেও না। একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে তখনই সফল বলা চলে যখন তা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় প্রকৃত উন্নতি ঘটাতে পারে। যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় জনগণের অনাকাঙ্ক্ষিত অথবা নিম্নমানের

দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়, অথচ সংখ্যাতত্ত্বের কারচুপি মারফত পরিকল্পনার লক্ষ্য পরিমাণগতভাবে অর্জিত হয়েছে বলে প্রচার করা হয়, সেই পরিকল্পনাকে পেরেসত্রোইকার প্রবক্তারা সফল আখ্যা দিতে নারাজ। এই ধরনের অনেকগুলি পরিকল্পনার ফল কী হয় তা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পূর্ব-ইউরোপের সমাজবাদী দেশগুলির তুলনা করলে সহজেই বোঝা যাবে। রুমানিয়া বা আলবেনিয়ার মতো দেশগুলিকে বাদ দিলে সোভিয়েত দেশে জীবনযাত্রার মান নিম্নতম। আর যদি পশ্চিম জার্মানি, জাপান, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বা কানাডার সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে ওই মান যে আরও অনেক নীচু, সেটা স্পষ্ট হবে। এই পার্থক্য কিন্তু পরম আশ্চর্যের ব্যাপার, কারণ সমগ্র পৃথিবীতে মাথাপিছু সম্পদের হার বোধহয় সোভিয়েত ইউনিয়নেই সর্বাধিক। পেরেসত্রোইকার প্রবর্তকেরা তাই অতীব ব্যগ্র যে যথাশীঘ্র সোভিয়েত দেশের সাধারণ মানুষ সেই সু-উচ্চ জীবনযাত্রার মানের অধিকারী হোন, যা সম্পদের সরবরাহ অনুযায়ী তাঁদের সহজেই প্রাপ্য, অথচ প্রাক্-পেরেসত্রোইকা যুগের অবৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাই সেই মান অর্জন থেকে তাঁদের বহুকাল বঞ্চিত রেখেছে।

সেই ১৯২৯-৩০ সাল থেকেই অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রচলন হয়, তার সঙ্গে আসে ব্যক্তিপূজা এবং খামখেয়ালি, অবাস্তব আদেশ নির্দেশ-নির্ভর প্রশাসন। ফলে, উৎপাদনের উপায়ের সামাজিক মালিকানার সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থের যে সংমিশ্রণ ঘটলে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পথ সুগম হয়, তা সোভিয়েত ইউনিয়নে অলভ্য রয়ে যায়। ওই সংমিশ্রণের প্রয়াস পেরেসত্রোইকার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

স্তালিন বলেছিলেন, ক্রমবর্ধমান চাহিদার সর্বাধিক তৃপ্তিই সমাজবাদের মূল অর্থনৈতিক সূত্র। কিন্তু, ইনস্টিটিউট অব স্পেস রিসার্চ-এর পরিচালক রোয়াল্ড সাগদেথেভ লিখেছেন, অতীতে, অর্থাৎ সুদীর্ঘ প্রাক্-পুনর্গঠন যুগে, ওই সূত্র ছিল নিতান্তই অভিলাষ-অঙ্কিত চিন্তা; বাস্তবে ওটা ছিল জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য বাগাড়ম্বর আর ভণ্ডামি। কৃষি এবং শিল্পে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণের ফলে সোভিয়েত জনসাধারণের প্রয়োজন আর সম্পদের তুলনায় তাদের জীবনযাত্রার মান ছিল অনেক নীচে। এটা কেন ঘটেছে তার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে ধরা পড়বে যে, যাকে সমাজবাদ বলা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে সমাজবাদ থেকে বিচ্যুতি। এই অভিমত যাঁরা পোষণ করেন, তাঁদের একজন হলেন ইকনমিকস ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক লিওনিদ আবালকিন। তিনি আমাদের স্পষ্টভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, সোভিয়েত ইতিহাসে যা ঘটেছে তা হল সামাজিক প্রগতি আনয়নে সক্ষম বিভিন্ন সম্ভাব্য পথের মাত্র একটির বাস্তবায়ন। কিন্তু সোভিয়েত দেশ আর সমগ্র পৃথিবীর বিপুল অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, আরও বিবিধ সম্ভাবনা উন্মুক্ত ছিল। ওই সম্ভাবনাগুলি অবহেলা না করলে সোভিয়েত দেশে জনগণের জীবনধারণের মান বহু পূর্বে অনেক বেশি উন্নত হতে পারত।

প্রাক্-পেরেসত্রোইকার কাল

চিন্তার দারিদ্র্য এবং বিকৃতির ফলে যেসব অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়েছে, সেগুলির উদাহরণ দিতে গিয়ে পেরেসত্রোইকার অনুগামীরা সহজেই কৃষি এবং শিল্পের নানা ঘটনাপ্রবাহের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরা দাবি করেন, ভ্রষ্ট সমাজবাদ বা স্তালিনবাদ থেকে তাঁরা সার্থক সমাজবাদ বা লেনিনবাদে ফিরে যেতে চান। লেনিনের নয়া অর্থনৈতিক নীতি (অর্থাৎ নিউ ইকনমিক পলিসি, সংক্ষেপে NEP বা নেপ) সোভিয়েত সমাজবাদের অর্থনৈতিক ইতিহাসে অবিশ্বাস্য কৃতিত্বের নজির স্থাপন করেছিল। এই নীতি যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের ফলে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতিকে শুধু পুনরুজ্জীবিতই করে নি, পাঁচ বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে এই নীতির ফলে সোভিয়েত অর্থনৈতিক প্রগতি প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বের প্রগতির মাত্রাকে স্পর্শ করে, এবং লক্ষণীয়ভাবে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান প্রাক্-মহাযুদ্ধ মানকে অতিক্রম করে। এই অগ্রগতি যে কত চমকপ্রদ, তা বরিস মোজায়েভের একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধ পাঠ করলে বোঝা যায়। ওই প্রবন্ধে মোজায়েভ লিখেছেন, প্রথম মহাযুদ্ধের কয়েক বছর আগেই রাশিয়ায় কৃষি আর শিল্পের প্রবৃদ্ধির হার আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেকগুণ বেশি ছিল—আর জার্মানি বা ফ্রান্সের মতো দেশগুলির তুলনায় ছিল আরও বহুগুণ বেশি। লেনিনের 'নেপ' কৃষকদের যে স্বাধীনতা দেয়, তাতে মাত্র এক বৎসরেই অর্থাৎ ১৯২২ সালে, কৃষকেরা অসাধারণ সাফল্য প্রদর্শন করে। পর-পর তিন বৎসর দুর্ভিক্ষের কবলে থাকা সত্ত্বেও ১৯২২ সালে সোভিয়েত দেশ ওই প্রথম উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হিসাবে রপ্তানি করে, পরের বৎসর ওই রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ছয়গুণ বৃদ্ধি পায়। ওই উদ্বৃত্ত ছিল সত্যিকার উদ্বৃত্ত, যুদ্ধের সময়ে বলপূর্বক কৃষকদের ন্যূনতম প্রয়োজনের পরোয়া না করে যা ছিনিয়ে নেওয়া হত, ওটা সেই ধরনের উদ্বৃত্ত নয়। সার্থক অর্থনৈতিক নীতির ফসল ওই প্রকৃত উদ্বৃত্ত কৃষিদ্রব্য সোভিয়েত কৃষি আর শিল্পে অসামান্য গতির সঞ্চার করে, এবং সোভিয়েত মুদ্রাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দান করে। যুদ্ধপূর্ব কৃষি-উৎপাদনের মাত্রা ১৯২৫ সালে অর্জিত হয়, আর শিল্পের ক্ষেত্রে ওই মাত্রা অর্জিত হয় ১৯২৭ সালে।

লেনিন-প্রবর্তিত "নেপ"-এর এই অবিস্মরণীয় সাফল্য সত্ত্বেও স্তালিন এবং তাঁর অনুচরবৃন্দ ১৯২৯ সালেই "নেপ" বাতিল করেন। তাঁরা বাধ্যতামূলকভাবে যৌথ চাষ শুরু করেন। এর বিষময় ফল ছিল নানাবিধ। মানবজাতির ইতিহাসে একটি জঘন্যতম গণহত্যা বা কৃষকবধ অনুষ্ঠিত হল। সুদীর্ঘকাল কৃষি-উৎপাদন ব্যাহত হল। যৌথ চাষ আরম্ভের পূর্ববর্তী বৎসরের—অর্থাৎ ১৯২৮ সালের—কৃষি-উৎপাদন পুনরায় লাভ করা গেল স্তালিনের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে। যৌথ খামার ছিল অনেক সময়েই সরকারি খামারের নামান্তর—এগুলির রাশীকৃত অব্যবস্থার কুফল সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৮০-র দশকেও অনুভূত হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে লেনিন-সমর্থিত ব্যক্তিগত ও সমবায় উদ্যোগ স্তালিনের আমলে বাতিল হওয়ায় যেমন সোভিয়েত জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রয়াস চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল, তেমনি শিল্পক্ষেত্রে "নেপ"-এর সমবায় ও আর্থিক স্বয়ম্ভরতার নীতি বর্জিত হওয়ার জন্যও ওই ক্ষতি আরও বেড়ে গেল, এবং দীর্ঘস্থায়ী হল। ১৯৮৮ সালের ২৮ জুন থেকে ১ জুলাই অবধি অনুষ্ঠিত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির উনবিংশ সম্মেলনে মিখাইল গোরবাচেভ তাই বলেছেন যে বলশেভিক বিপ্লবের ৭০ বৎসর পরেও বহু জেলায় বাসস্থান, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি এবং চিকিৎসাব্যবস্থা নিম্ন মানের। তা ছাড়া, গ্রামের বাড়িগুলিতে আধুনিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার সরবরাহ অসন্তোষজনক; বিদ্যুৎ-সরবরাহ অনিশ্চিত; গার্হস্থ্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার দুষ্কর; আর রাস্তাঘাটের অবস্থাও শোচনীয়।

১৯৮৮ সালের ২৮ জুন উনবিংশ পার্টি সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে গোরবাচেভ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, বাধ্যতামূলক যৌথ চাষ কৃষি উন্নয়নের মূল শর্তটিই লঙ্ঘন করেছিল। ওই শর্তটি হল, যদি ব্যক্তিকে অবহেলা করা হয়, যদি তার কাজ আর জীবনযাত্রার অবস্থার প্রতি ঔদাসীন্য দেখানো হয়, তাহলে কৃষি-খাতে যত সম্পদই বিনিয়োগ করা হোক না কেন, ঈপ্সিত ফল-লাভ অসম্ভব। অতএব, খেতখামারে উৎপাদনসম্পর্কের পরিবর্তনই পেরেসত্রোইকার কৃষি-নীতির সারবস্তু। এর ফলে কৃষকেরা বদখেয়ালি নির্দেশনামা থেকে পরিত্রাণ পাবে, কর্ষিত জমির কর্তা যে সে নিজেই, এই ভাবনা কৃষককে অনুপ্রাণিত করবে; এবং জমি থেকে তার বিচ্ছিন্নতাবোধ বিদূরিত হবে। যেসব জায়গায় এই বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠন

কার্যে পরিণত করা হয়েছে, সেখানে শীঘ্রই এর সুফল প্রকট। ১৯৮৮ সালের ১৩ মে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সভায় স্বয়ং গোরবাচেভ স্বীকার করেছেন যে, যৌথ বা সরকারি খামারে ২০-৩০ জন বিশারদের সহায়তা সত্ত্বেও যে স্থানে দশকের পর দশক কৃষি-উৎপাদন প্রায় একই অবস্থায় থাকে, ওই স্থলে ইজারা-চুক্তি ইত্যাদি বন্দোবস্ত মারফত এক-একটি কৃষক পরিবার দুই-এক বৎসরের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য হারে উৎপাদন বাড়ান, আর গাভী-প্রতি দুধের উৎপাদন দ্বিগুণ বা তারও বেশি করে ফেলেন। এমন উদাহরণও আছে, একটি বৃহৎ খামারের একই ভবনের অভ্যন্তরে যৌথ বা রাষ্ট্রীয় খামারের চাষিরা যদি একটি গাভী থেকে বৎসরে ২৫০০ কিলোগ্রাম দুধ পান, চুক্তিবদ্ধ কৃষক পরিবার পান ৪১০০ কিলোগ্রাম।

কৃষকেরা যে এই বিপুল সাফল্য অর্জন করেছেন, তার একটি প্রধান উৎস হল অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের দ্বারা সৃষ্ট স্বাধীনতাবোধ। পরিবারভিত্তিক ইজারা-চুক্তি ইত্যাদি নোতুন ব্যবস্থাপনাপদ্ধতি কৃষকের মনে গভীরভাবে শৃঙ্খলমুক্তির ভাবনা সঞ্চারিত করেছে। কৃষকেরা এখন তাঁদের কর্মক্ষমতা ও সৃজনীশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারছেন, কারণ আর তাঁরা পার্টির বা সরকারের কর্মকর্তাদের অবাস্তব আদেশে জর্জরিত নন—তা বীজবপন, কর্ষণ, বা ফসল আহরণেই হোক, বা গবাদি পশুর গৃহনির্মাণেই হোক। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যায়, গবাদি পশুর যে আবাসস্থল নির্মাণে যৌথ খামারের ব্যয় হবে ১,০০০০০ রুবল, ইজারা-চুক্তি পদ্ধতিতে কর্মরত একজন কৃষক ওটি মাত্র ১৪,০০০ রুবল দিয়ে তৈরি করেন। যৌথ খামারের তুলনায় নিজের খামারে একজন কৃষক ঢের বেশি আন্তরিকতা নিয়ে দীর্ঘতর সময় কাজ করেন। কারণ তিনি নিজেকে জমির কর্তা মনে করেন। বিশ্ববিশ্রুত চক্ষুচিকিৎসক সিভ্যাতোস্লাভ ফিওদোরভ, যিনি মাইক্রোসার্জারির আবিষ্কারক, তিনি এই যুক্তিতে লিখেছেন যে কৃষকদের ১০০ বৎসরের জন্যও জমি ইজারা দেওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে কৃষক আর তাঁর পরিবার এমনভাবে জমির ব্যবহারে আগ্রহী হবেন যে, পরবর্তী কয়েক প্রজন্মের সন্তান-সন্ততিরা উর্বর জমি ভোগ করতে পারবে। পক্ষান্তরে, সরকারি খামারে সাধারণত জমির শোষণ হয় মাত্রাতিরিক্ত। ফলে, জমির উর্বরতা শুধু যে কমে তাই নয়, দূর ভবিষ্যতে ওই জমি মরুভূমিও হয়ে যেতে পারে।

যেমন কৃষিকার্যে, তেমনি শিল্পক্ষেত্রে, নোতুন অর্থনৈতিক সংস্কার তখনই কার্যকর হবে যখন তা প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব স্বার্থকে প্রভাবিত করবে, এবং প্রত্যেক মানুষের কাছে অত্যাবশ্যক বিবেচিত হবে। একথা গোরবাচেভ পরিষ্কারভাবে ১৯৮৮ সালের ২৮ জুন তাঁর ভাষণে ঘোষণা করেছেন। আর পেরেসত্রোইকা-গ্লাসনসত প্রবর্তনের পূর্বে অর্থনীতিবিদ ভিকতর নোভোজিলোভ লিখেছিলেন, সোভিয়েত দেশে পরিকল্পিত অর্থনীতির গণতন্ত্রীকরণ খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে, এবং গণতন্ত্রীকরণ হয়েছে কিনা তা তখনই বোঝা যাবে, যখন সঠিকভাবে প্রতিপালিত একটি সরকারি নির্দেশ যাঁদের প্রতি উদ্দিষ্ট তাঁদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থ পুষ্ট করে। প্রাক্-পেরেসত্রোইকা যুগে সাধারণ মানুষের ন্যায্য স্বার্থের ব্যাপারটি ছিল প্রায় অবজ্ঞাত। তাই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে (ব্যতিক্রম বাদ দিলে) নানাবিধ ব্যাধি মারাত্মক আকারে দেখা দিয়েছিল—যেমন সম্পদের অপচয়, অকর্মণ্যতা আর ভষ্টাচার। এর ফলে এক দিকে প্রায় সব নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহে অবিরাম ঘাটতি, এবং সর্বব্যাপী কালোবাজার জনসাধারণকে সদাই ব্যতিব্যস্ত করে রাখত। অপর দিকে, খানিকটা অকর্মণ্যতা আর খানিকটা পার্টির আর সরকারের আমলাদের প্রযুক্তি-উন্নয়নের প্রতি মজ্জাগত উদাসীন্যের ফলে (যা এই প্রবন্ধে পরে আরও বিশদ ভাবে বলা হবে), সমগ্র অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। একটি নির্দিষ্ট উদাহরণে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। ১৯৭৯-৮০ সালের একটি হিসেব থেকে জানা যায়, যে পরিমাণ জাতীয় উৎপাদনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে ১৪৯০ কিলোগ্রাম কয়লা এবং ১৩৫ কিলোগ্রাম ইস্পাত ব্যবহার করতে হয়, তার জন্য পশ্চিম জার্মানিকে প্রয়োগ করতে হয় ৫৬৫ কিলোগ্রাম কয়লা আর ৫২ কিলোগ্রাম ইস্পাত, আর সুইজারল্যান্ডকে ৩৭১ কিলোগ্রাম কয়লা আর ২৬ কিলোগ্রাম ইস্পাত। এই হিসেব পশ্চিমী সূত্র থেকে গৃহীত, তাই এটি নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু এই হিসেবের মোটামুটি যথার্থতা প্রতীয়মান হয় ১৯৮৭ সালে দেওয়া মিখাইল গোরবাচেভের মুরমানস্ক বক্তৃতা পড়লে। ওতে গোরবাচেভ অকপটে বলেছেন, সম-পরিমাণ জাতীয় আয়ের জন্য অপরাপর উন্নত দেশ-গুলির তুলনায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ বেশি শক্তি এবং অন্যান্য বাস্তব সম্পদ ব্যয় করতে হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে উন্নয়নের জন্য এভাবে অমূল্য সম্পদের নিদারুণ অপব্যবহার করে যেতে পেরেছে, তার কারণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বাধিক প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী।

রাষ্ট্রাধীন শিল্পের উপরোক্ত ব্যাধিগুলি নিরাময় করতে হলে যা অবশ্যপ্রয়োজনীয় তা হলে প্রতিটি ব্যক্তিকে—সে কর্মীই হোক বা ব্যবস্থাপকই হোক—তার নিজস্ব কাজের জন্য কঠোরভাবে দায়িত্ব মেনে নিতে হবে। এই প্রয়োজনীয়তার প্রকৃত গভীরতা অনুধাবন করতে গেলে তাত্তিয়ানা জামলাভস্কায়া কর্তৃক পরিচালিত একটি সমীক্ষার ফলাফল জানতে হবে। যেসব শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী পেরেসত্রোইকার তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক প্রণয়ন প্রবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, জামলাভস্কায়া তাঁদের একজন। তাঁর পথনির্দেশক সমীক্ষায় দেখা যায়, শতকরা ২০ ভাগেরও কম ব্যক্তি তাঁদের পেশায় যা করণীয় ও সাধ্যায়ত্ত তা করতে উৎসাহী। এর ব্যাখ্যা আবিষ্কার করতে গেলে যেগুলি সমাজবাদী ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হিসেবে দীর্ঘকাল পরিগণিত, সেগুলির কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে পর্যালোচনা করতে হবে। পর্যালোচনায় প্রতিষ্ঠিত হবে যে ওই নীতিগুলি সুচিন্তিত ছিল না, এবং এগুলি কর্মে অনীহার স্থায়ী কারণ। একটি মুখ্য দৃষ্টান্ত : চিকিৎসা (এমনকী উন্নততম মানের চিকিৎসা), স্বাস্থ্য-নিবাসে স্থানলাভ, বাসভবন, ইত্যাদি মহার্ঘ দ্রব্য নগণ্য বা বিনা মূল্যে বিতরণ সমাজবাদী ব্যবস্থাপনার অন্যতম মূল নীতি। এই নীতি যখন কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হচ্ছে তখন কিন্তু ওই দুর্লভ দ্রব্যগুলি কী সূত্রে অনুযায়ী বিতরণ করা হচ্ছে, তা জানবার বা অনুসন্ধান করার অধিকার সাধারণ মানুষের থাকছে না। অথচ, ওই দ্রব্যগুলি যে প্রয়োজনের তীব্রতা বা কর্মে বিশেষ নৈপুণ্যের ভিত্তিতে বণ্টন করা হচ্ছে না, তা সহজবোধ্য। উপরন্তু, সাধারণ মানুষের সামনে যা অনায়াসদৃশ্য, তা হল ওই দ্রব্যগুলির বিপুল ঘাটতি, যার সুযোগে পার্টি আর সরকারের প্রভাবশালী আমলারা এগুলির বণ্টনে ক্ষমতার অপব্যবহার, সম্পদের অপচয় এবং ভষ্টাচারে লিপ্ত থাকতে পারেন। এভাবে নানা দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের স্বল্প মূল্যে বা বিনা মূল্যে বিতরণের সমাজবাদী নীতি বাস্তবে সাধারণ মানুষের কর্মে প্রবৃত্তির বিনাশের বা দুর্বলতার জন্য দায়ী। এই ধরনের নীতির অপর একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত হল মজুরির সমতা। ভণ্ডামিমুক্ত পেরেসত্রোইকার প্রবক্তারা নির্দ্বিধায় এসব নীতিকে বিপজ্জনক গোঁড়ামি বা কল্পনাবিলাস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সামাজিক পরগাছাবৃত্তি তাঁদের কাছে অসহ্য। একজন অলস, অকর্মণ্য কর্মী (ব্যবস্থাপক) যা রোজগার করবেন, অপর একজন পরিশ্রমী, কর্ম-কুশল ব্যক্তিও তাই রোজগার করবেন—এটা তাঁরা মানতে রাজি নন। অতএব ক্রমে-ক্রমে, সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগে ১৯৮৯ সালের মধ্যে খোজরাশচট বা আর্থিক স্বয়ম্ভরতার (দায়িত্বশীলতার) প্রচলন করা হবে।

১৯৮৮ সালের ২৮ জুনে প্রদত্ত ভাষণে গোরবাচেভ বলেছেন, বেতন-সমতা নির্মূল করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে, প্রতিটি যৌথ উদ্যোগের বিভাগ আর উপবিভাগে, পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খোজরাশচট প্রবর্তন করতে হবে।

১৯৮৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত যেখানেই খোজরাশচটের প্রয়োগ হয়েছে, প্রায় সর্বত্রই অভূতপূর্ব সুফল মিলেছে। কর্মীদের কুশলতা আর রোজগার বেড়েছে, সমগ্র অর্থনীতির ভিত্তিও দৃঢ়তর হয়েছে। পেরেসত্রোইকার সাফল্যের জন্য যেমন খোজরাশচট প্রয়োজন, তেমনি খোজরাশচটের কার্যকরতার জন্য দরকার গ্লাসনসত। খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা বা ব্যবস্থাপনার গণতন্ত্রায়ন খোজরাশচটের একটি প্রধান অবলম্বন। বাস্তব উদাহরণ ছাড়া (শুধুমাত্র তাত্ত্বিক বুলি আউড়ে) এই অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি বোঝা যাবে না। মস্কোর উপকণ্ঠে অবস্থিত এক গৃহোপকরণ প্রস্তুতের কারখানা নেওয়া যাক। বহু বৎসর যাবৎ এই কারখানা ক্ষতিতে চলছিল; লাভের কোনো আশাও ছিল না। ওই অবস্থায় একটি আকস্মিক বিস্ফোরণ কারখানাটিকে বিপর্যস্ত করল। ইতিমধ্যে দেশে পেরেসত্রোইকার আবাহন ঘটেছে। অতএব, প্রাক্-পেরেসত্রোইকা যুগের মতো নামমাত্র কাজ করে বা না করে রোজগার অব্যাহত রাখার সম্ভাবনা ক্ষীয়মাণ। অন্যত্র নানা কর্মক্ষেত্রে খোজরাশচটের সাফল্যের বার্তাও ওই কারখানার কর্মীদের কাছে পৌঁছেছিল। তাই, গণতান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে, ওই কারখানার ৪০০ শ্রমিক আর পরিচালক নিজেরাই সরকার থেকে কারখানাটি ইজারা নিলেন। তাঁরা খোজরাশচট প্রয়োগ করলেন, এবং আঠারো মাসে তাঁরা যে-পরিমাণ কাজ করলেন, তা ছিল প্রাক্-পুনর্গঠন যুগের পাঁচ বৎসরের কাজের সমান। অথচ, তাঁদের যন্ত্রপাতি ছিল জীর্ণ, নিজেরাই নিষ্ঠাভরে মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণ করে পুরাতন যন্ত্রপাতি দিয়েই তাঁরা কাজ চালু রাখলেন। তা ছাড়া, উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণে, অথবা কাগুজে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী চাহিদাহীন দ্রব্যের উৎপাদন অব্যাহত রাখার ব্যাপারে, রাষ্ট্রীয় আমলাবর্গের নানা অবাস্তব নির্দেশও তাঁরা মেনে চলতে বাধ্য ছিলেন। এসব দুস্তর বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও কর্মীদের উৎপাদন আর মজুরি বিপুল হারে বেড়েছিল, লাভ হয়েছিল শতকরা ১৫০ ভাগ। এই অভাবনীয় সাফল্যের প্রধান কারণ ছিল, কর্মীরা জীবনে প্রথম তাঁদের কারখানার আয়ের ওপর কর্তৃত্ব অর্জন করেছিলেন—সদ্যোলব্ধ স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে তাঁরা তাঁদের আয়ের একাংশ দিয়ে বাসভবন, ক্রীড়াঙ্গন ইত্যাদিও নির্মাণ করেছিলেন। পেরেসত্রোইকা, খোজরাশচট আর গ্লাসনসত থেকে যে নোতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার যুগ শুরু হয়েছে, তাতে পুরনো যুগে যা ছিল অকল্পনীয়, তা-ই এখন হয়ে উঠেছে প্রেরণাদায়ী বাস্তবতা। যেমন, নতুন যুগে কারখানার পরিচালক নির্বাচনের অধিকার শ্রমিকদের অর্পণ করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনার এই গণতন্ত্রায়ন প্রত্যাশিতভাবেই শ্রমিকদের কাজে আগ্রহ আর দক্ষতা বাড়িয়ে দিয়েছে।

অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে অগণিত যৌথ, সমবায় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে। যে কয়লাখনিগুলি পেরেসত্রোইকা অনুযায়ী কাজ করছে, সেগুলিতে আর্থিক আত্মনির্ভরতা এসেছে, শ্রমিকদের বেতন বেড়ে জাতীয় আয়ের তিনগুণ হয়েছে, অন্যান্য সুবিধাও তাঁরা ভোগ করছেন। বেলোরাশিয়া রেলপথের যৌথ উদ্যোগে কর্মীরা উৎপাদন আর লাভের ওপর কর্তৃত্ব গ্রহণ করে তাঁদের সমস্তরকম কাজের সম্পূর্ণ পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে সম্পদের অপচয়, দুর্ঘটনা, কাজের সময়ের অপব্যবহার ইত্যাদি কমিয়েছেন, এবং বেতনও বাড়িয়েছেন। বেলোরাশিয়ার উদাহরণ অনুসরণ করে মস্কো রেলপথের কর্মী-ব্যবস্থাপকেরা এত বিশাল পরিমাণ সঞ্চয় করেছেন যে তা থেকে শিশুনিকেতন, বাসভবন ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে। আর যদি জনসাধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় নানাবিধ পরিসেবার কথা ভাবা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে ইজারা-ভাড়া-চুক্তি ইত্যাদি নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে ওই পরিসেবার যা উন্নতি ঘটেছে তা এককথায় অপরিমেয়। কেশসজ্জাই হোক বা জুতো মেরামতই হোক, ট্যাকসি-ভাড়া করাই হোক বা মোটরগাড়ি আর দূরদর্শন যন্ত্র মেরামতই হোক, সব ব্যাপারেই নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সুফল প্রকট। অতীতে আদিম কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় একটি গাড়ি বা দূরদর্শন যন্ত্র মেরামতের জন্য সরকারি সংস্থায় দিলে প্রবল প্রতিপত্তিশালী সরকারি আমলারা কবে ওটা মেরামত করার সময় পাবেন, বা কত উৎকোচ দাবি করবেন, তা ছিল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। কিন্তু নোতুন ব্যবস্থায় একদিনেই ওগুলি মেরামত হয়ে যাচ্ছে। পেরেসত্রোইকা, খোজরাশচট আর গ্লাসনসতের জন্য ক্রমবর্ধমান রোজগার আর কর্মপ্রেরণা এবং নিত্যনোতুন প্রচেষ্টার যে ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছে, তা থেকে ইজারা-ভাড়া-কর ইত্যাদি বাবদ রাষ্ট্রের আয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মস্কোর উপকণ্ঠে কাছাকাছি ছুটি সবজির দোকান। একটি পরিচালনা করেন জনৈকা মহিলা আর তাঁর কন্যা। অপরটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা, সেখানে আঠারো জন লোক কর্মরত। ছুটি দোকানের আয় প্রায় সমান-সমান। মা-মেয়ে গ্রাহকদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে না-পড়ে ধৈর্য আর দ্রুততার সঙ্গে তাদের চাহিদা মিটিয়ে দেন। কিন্তু অপর দোকানে কর্মচারীরা অলস আর বদমেজাজি। অতীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্ববৃহৎ উষ্ণ খামারে উৎপাদিত শশা অনেক সময়েই দোকানে পৌঁছত না। এখন আর ওই শশায় পচন ধরে না, কারণ পেরেসত্রোইকার ফলে ব্যাবসা-বাণিজ্যের নবজন্ম ঘটেছে, এবং শ্রমিক-ব্যবস্থাপকের কর্মে নিষ্ঠা আর তৎপরতা অনেক বেড়েছে। অতীতে নববর্ষের দিনে তরমুজ খাওয়ার জন্য অনেক আমলাতান্ত্রিক দড়িটানাটানি করতে হত। কিন্তু পেরেসত্রোইকার কল্যাণে এখন অনেক পরিবারই পয়লা জানুয়ারি স্বচ্ছন্দে তরমুজ সংগ্রহ করতে পারছেন। এ প্রসঙ্গে লেনিনকে স্মরণ করা যায়। লেনিন লিখেছিলেন, যদি আমরা স্বয়ম্ভরতার ভিত্তিতে ট্রাস্ট ইত্যাদি বহুবিধ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত করি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রক্রিয়াগুলি অবলম্বন করেও নিজেদের স্বার্থ পুরোপুরি সংরক্ষণে সমর্থ না হই, তাহলে প্রমাণিত হবে যে আমরা পুরোপুরি নির্বোধ। অবশ্য, পেরেসত্রোইকার পথে এখনও বিস্তর বাধা। রাষ্ট্রায়ত্ত, সমবায় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ পুনর্গঠনের জন্য যেসব আইন প্রণীত হয়েছে, তাতে অনেক ত্রুটি রয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া, স্থিত স্বার্থের প্রহরীরা পুনর্গঠনের বিরোধিতায় সক্রিয়। কিন্তু পেরেসত্রোইকার সমর্থকরাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—অতীতের যে ব্যবস্থায় শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের রোজগারের জন্যে বাস্তব কাজের ওপর নির্ভর করতে হত না, যে ব্যবস্থায় নিয়মিত কাজের সময়ে যারা যত অলস, অনিয়মিত সময়ে কাজের জন্য অতিরিক্ত (ওভারটাইম) ভাতা পেয়ে তারা তত বেশি আয়ের অধিকারী, সেই উদ্ভট ব্যবস্থার অবসান তাঁরা ঘটাবেনই।

অর্থনৈতিক পুনর্গঠন-প্রসূত জনস্বার্থ-পোষক নানা ব্যাপারের পর্যালোচনা করে "মস্কো নিউজ" পত্রিকায় দুইজন প্রখ্যাত সাংবাদিক লিখেছেন: এটা এমন একটা সময় যখন অর্থনীতিবিদরা সম্মানিত নায়কের মর্যাদায় ভূষিত হচ্ছেন। তাঁরা নিজেদের হাতে হাতুড়ি ধরছেন না বটে, কিন্তু তাঁরা যেসব কাজ করছেন তার ফলে আজ চুক্তিবদ্ধ দোকানে এমনকী জুতোর পেরেকও নিখুঁতভাবে তাড়াতাড়ি লাগানো হচ্ছে। এই মন্তব্য উদ্ধৃত করার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। দক্ষিণ এশিয়ার দরিদ্র দেশগুলিতে (যেমন ভারতে আর বাংলাদেশে), যাঁরা সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং নীতি প্রণয়নে প্রভাবশালী অর্থনীতিবিদ, ব্যতিক্রম বাদ দিলে, তাঁরা কেউই উপরোক্ত সোভিয়েত অর্থনীতিবিশারদের মতো নীতি রূপায়নে অতীব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা,

সংগঠন বা প্রশাসন নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না। তাঁদের সংখ্যাতাত্ত্বিক জুডো-কারাটের আড়ালে হতভাগ্য জনসাধারণের বহুবিধ ন্যায়সঙ্গত দৈনন্দিন চাহিদা হারিয়ে যায়—পরিকল্পনা দলিলেই হোক, বা ধনী পশ্চিমী দেশে প্রশংসিত গবেষণাপত্রেই হোক, খোজরাশটচ সম্পর্কে তাঁদের ন্যূনতম চেতনার চিহ্নও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সরকারি ক্ষমতার গরিমায় আচ্ছন্ন থেকে, এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন শত-শত অসুবিধা হতে মুক্ত থেকে, তাঁরা মনে করেন যে কাগজে কলমে তাঁরা যদি জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৫ বা ৬ বলে প্রমাণ (অন্তত প্রচার) করতে পারেন, তাহলেই কর্তব্য সুসম্পন্ন হয়েছে।

পেরেসত্রোইকার তাত্ত্বিক ভিত্তি পরিশীলিত এবং চিত্তাকর্ষক ভাবে রচিত হয়েছে। এর জন্য শুধু অর্থ-নীতিবিদ বা সমাজবিজ্ঞানীরাই নন, প্রাকৃতিক ও অন্যান্য বিজ্ঞানের বিশারদরাও হাত মিলিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, চক্ষুরোগবিশেষজ্ঞ ফিওদোরভ লিখেছেন, মানবজাতির ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ যেসব আবিষ্কার ঘটেছে তার মধ্যে ছুটি হল মুদ্রা এবং বাজার। বাজারের শক্তিগুলিকে (যা বাজারের উৎস বা বাজার থেকে উদ্ভূত) নিষিদ্ধ করার ফল হল ব্যক্তির উদ্যম ও স্বাধীনতাকে খর্ব করা, অর্থনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে অতিকেন্দ্রীকরণ ঘটানো, এবং ব্যক্তির বিযুক্তি বা শোষণের জন্ম দেওয়া। প্রাক্-পেরেসত্রোইকা যুগে সোভিয়েত ইউনিয়নে পার্টি (অর্থাৎ কমিউনিস্ট দল) সমগ্র অর্থনীতির ওপর অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রয়োগ করত, এবং পার্টির আমলাবর্গ বলপূর্বক বাজারের কার্যাবলী আত্মসাৎ করেছিল। ফলে, সামাজিক সম্পত্তি, যা প্রকৃতপক্ষে জনগণেরই সম্পত্তি, তা আমলার সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়। এতে সাধারণ মানুষ উৎপাদনের উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং অনিবার্যভাবে শোষিত হয়—প্রকাশ্য কিংবা প্রচ্ছন্ন ধরনে। চূড়ান্ত কেন্দ্রী-করণের বলে অমিতশক্তিধর একজন আমলা মনে করেন যে তাঁর যে-কোনো আদর্শ ই যুক্তিসঙ্গত এবং অপরিবর্তনীয়, কারণ এ আদেশ স্বয়ং তিনি দিয়েছেন। এরকম দম্ভের বশবর্তী হয়ে তিনি আর সাধারণ মানুষের (শ্রমিকের বা ক্রেতার) ন্যায়সঙ্গত ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা চিন্তা করেন না। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল—সাধারণ মানুষ নানারূপে বিযুক্তি আর শোষণের শিকার হন। সহজতম উদাহরণ: আমলাদের উদ্ভট আদেশে জনতার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পরিবর্তে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন বাড়তে থাকে। জটিল এবং প্রকৃষ্ট উদাহরণ: ব্যক্তির কাজ আর আয়ের মধ্যে কোনো যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না ; অলস / অসৎ এবং কর্মঠ / সৎ শ্রমিকদের আয় সমপরিমাণ হলে সৎ, কুশলী কর্মীরা বুঝতে পারেন যে, কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় স্তরে তাঁদের যোগ্যতার যথাযথ মূল্যায়ন হচ্ছে না ; অতএব তাঁরা নিজেদের শোষিত বোধ করেন। তা ছাড়া, তাঁদের প্রয়োজন বা স্বার্থ, ভাবনা বা ভাবাবেগ তো ক্ষমতাসীন আমলাদের কাছে অবান্তর, এটা জেনে নিষ্ঠাবান ও নিপুণ কর্মীরা বিযুক্তিবোধে আচ্ছন্ন হন।

যখন সামাজিক সম্পত্তি আমলার সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়, তখন (ব্যতিক্রম বাদ দিলে) আমলা এবং শ্রমিকদের মধ্যে অলস, দায়িত্বহীন, অসৎ ও অকর্মণ্য হবার প্রবণতা দেখা দেয়। সম্পদ সংরক্ষণে তাঁদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ লক্ষ করা যায় না ; সম্পত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কোনো হাসপাতালে চশমার কাচ বা ইনজেকশনের যন্ত্র নষ্ট হলে, অথবা দরজার হাতল ভেঙে গেলে, কেউই তা নিয়ে উৎকণ্ঠিত হন না। এক-জন শল্যচিকিৎসক রাষ্ট্রীয় কারখানা থেকে কিছু গুরুত্ব-পূর্ণ যন্ত্রপাতি আসার অপেক্ষায় আছেন ; দীর্ঘ এবং ব্যর্থ প্রতীক্ষার পর শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিদেশ থেকে ওই যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হয়। এভাবে রাষ্ট্রাধীন সংস্থাগুলি যথেষ্ট কার্যকারিতা অর্জনে তথা কর্মপ্রেরণা সৃজনে ব্যর্থ হয়, এবং খেতখামারেও অদ্ভুত-অদ্ভুত ঘটনা দেখা যায়। গাছের ফল গাছেই রয়ে গেল, সংগ্রহ

করা হল না। আলু-গাজর হয়তো মাঠেই পচে গেল, অথবা গবাদি পশুকে খাওয়ানো হল। পশুখাদ্যের জন্য যে শস্য চাষ করা হয়েছে, তা দিনের বেলাতেও চুরি হয়ে যায়। পার্টির আর সরকারের আমলাদের ব্যক্তিগত গবাদি পশু নিখরচায় যৌথ বা রাষ্ট্রীয় খামারে প্রতিপালিত হয়। উপরন্তু, আমলাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আহার্য থেকে কমপিউটার পর্যন্ত যে-কোনো দ্রব্যই কালোবাজারিদের করায়ত্ত। কালোবাজারের বার্ষিক লেনদেনের আর্থিক পরিমাণ কত শত বিলিয়ন রুবল, কা সঠিকভাবে নির্ণয় করাও সম্ভব নয়।

আমলাতান্ত্রিক কল্পলোকে (ব্যুরোক্রেটিক ইউ-টোপিয়াতে) ভাবপ্রবণ সমাজবাদ (সেনটিমেনটাল সোশ্যালিজম) গড়ে তুললে রাষ্ট্রীয় সংস্থায় উপরোক্ত গলদগুলি অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এই কল্পরাজ্যে একজন ব্যক্তিকে ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ-উচ্চাশা ও অনুভূতি-সম্পন্ন সজীব মানুষ বলে গণ্য করা হয় না, তাঁকে মনে করা হয় একজন বিমূর্ত শ্রমিক, যিনি প্রতিনিয়ত আমলাবর্গের আদেশ আর আদর্শগন্ধী গণবাণী হজম করে বেঁচে থাকবেন। ওই গলদগুলি দূর করার জন্য পুন-র্গঠনের প্রতিভূরা লেনিনবাদকে পুনরুজ্জীবিত করছেন, এবং ব্যক্তিগত উদ্যমের জন্য বাস্তব (আর্থিক) উৎসাহের (পুরস্কারের) যথাযথ গুরুত্ব তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন। পেরেসত্রোইকা, খোজরাশ্চট আর গ্লাসনসত অর্থনীতিতে গণতন্ত্রায়ন ঘটাচ্ছে, উৎপাদনসম্পর্কে পরিবর্তন আনছে, এবং সামাজিক সম্পত্তি জনসাধারণ-কে প্রত্যর্পণ করছে, যাতে সোভিয়েত বিপ্লবের লক্ষ্য-গুলি পূর্ণ মাত্রায় অর্জিত হয়। সামাজিক সম্পত্তির নানা রূপ হতে পারে : রাষ্ট্রায়ত্ত, সমবায়িক এবং ব্যক্তিগত। কেবলমাত্র ধনতন্ত্রীদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়াই নয়, ওই সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত লাভের সম-বণ্টনও ছিল সোভিয়েতে বিপ্লবের উদ্দেশ্য। নোতুন যেসব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত হচ্ছে—ইজারা, চুক্তি, আর্থিক স্বশাসন—তাতে বিপ্লবের এই উদ্দেশ্য সাধিত হবে, কারণ ওই ব্যবস্থাগুলি সার্থকভাবে মেহনতি জনতার কাছে উৎপাদনের উপায় হস্তান্তরিত করছে। যখন সাধারণ মানুষ দেখেন যে, সম্পত্তি তাঁদেরই, এবং ব্যক্তির কাজের গুণ-পরিমাণ এবং রোজগারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতা তাঁদের নিজেদেরই আছে, তখন কর্মী হিসেবে তাঁদের জীবন-ধারণে বিশাল পরিবর্তন আসে। তাঁদের চৌর্যপ্রবৃত্তি লোপ পায়। তাঁরা আর সেইসব আমলাকে ভয় পান না, যাঁদের জীবিকা চৌর্যবৃত্তি অব্যাহত থাকার ওপর নির্ভরশীল, এবং মানুষে-মানুষে অবিশ্বাস গড়ে তোলাই যাঁদের কায়েমি স্বার্থ। ওই ভয় থেকে পরিত্রাণ পেলে, এবং পরিশ্রম আর কুশলতার পুরস্কার পরিদৃশ্যমান হলে, সাধারণ মানুষ আর্থিক উন্নতি ছাড়াও এক অসীম আনন্দের নাগাল পান—সে স্বাধীনতাবোধও আত্মার সমৃদ্ধিতে অনুপ্রাণিত হয়। এই পরিস্থিতিতে, কারখানা-পরিচালক-পদের কোনো প্রার্থী প্রাক্-নির্বাচনী সভায় কর্মকুশলতা আর ডিসিপ্লিনের ওপর তাঁর আস্থা ব্যক্ত করলে শ্রমিকেরা তাঁকেই নির্বাচনে জয়যুক্ত করতে পিছপাও হন না।

আমলাতান্ত্রিক কল্পরাজ্যে সামাজিক সম্পত্তি জনতার অধিকারে না থেকে আমলাবর্গের অধিকারে থাকার একটি বিষম কুফল হল নেতৃত্ব ও উদ্যমকে শৃঙ্খলিত করা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অপচয় ঘটানো এবং বৈজ্ঞানিক প্রগতিকে আড়ষ্ট করা। আমলাদের অন্ধবিশ্বাস আর স্বেচ্ছাচারিতা অতীতে অনেক বিজ্ঞানের, বিশেষত প্রাণিবিদ্যার, অগ্রগতি রুদ্ধ করেছে, আর অনেক বিজ্ঞানকেই তুমুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। পদার্থবিদ্যা বা বলবিদ্যা যে রেহাই পেয়েছে তার প্রধান কারণ—এই সায়েন্স রিসার্চ পরিচালক রোয়াল্ড সাগদেয়েভ এটা অকপটে ব্যক্ত করেছেন—আমলারা বোমা আর ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতে আগ্রহী ছিলেন। আজ এটা অবিশ্বাস্য—কিন্তু অতীতে ব্যক্তিপূজার যুগের নির্মম সত্য—যে বিনা কারণে ভ্যাভিলভ-এর মতো প্রখ্যাত প্রাণী-তত্ত্ববিদদের হত্যা করা হয়েছিল। যাদের হত্যা করা

হয় নি, তাদেরও কিন্তু আমলাদের নিষ্পেষণ থেকে রেহাই দেওয়া হয় নি। একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত: মহাকাশ-ভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার প্রধান রূপকার সার্জি কোরোলিওভ ছিলেন অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন; তাঁকেও ক্ষমতামদমত্ত মতলববাজ আমলাদের হাতে ব্যতিব্যস্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু কোরোলিওভ শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেও ছিলেন অসাধারণ। তিনি নিজেকে মহাকাশগবেষণায় বিলীন করে দিয়ে জাগতিক জ্বালাযন্ত্রণার কথা বিস্মৃত হতে পারতেন। তিনি আমলাতান্ত্রিক বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে সমগ্র পৃথিবীকে তাঁর আবিষ্কারশক্তিতে চমকিত করেছিলেন—আর আমলাবর্গের হাতে কোরোলিওভ-এর হয়রানির ব্যাপারে যিনি লিখেছেন, তিনিও একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, ভেসভোলোদ ফিওদোসিয়েভ।

আমলাতন্ত্রের চিন্তার অভ্যাসের জড়তা

কিন্তু যাঁরা কোরোলিওভের মতো অতুলনীয় প্রতিভাধর নন, তাঁদের অনেকে আবিষ্কার আমলাদের অবহেলায় দশকের পর দশক অব্যবহৃত রয়ে গিয়েছে। অগণিত দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি হল: জনৈক আবিষ্কর্তা কারখানার বর্জিত দ্রব্য থেকে একটি জিনিস তৈরি করেন, যা ব্রোনজের বিকল্প হওয়ায় দেশের জন্য অত্যাবশ্যক ডলার-জাতীয় বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাতে পারে। বিশ বছর এই আবিষ্কার আমলাদের দ্বারা অবজ্ঞাত রইল। তারপর পেরেসত্রোইকার আমলে ওই আবিষ্কার স্বীকৃতি লাভ করল। অপর একজন আবিষ্কর্তা সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরভাগে তুষারাবৃত সুমেরু অঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী বাসগৃহের নকশা তৈরি করেন। কানাডায় তাঁর এই নকশা সমাদৃত এবং ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে তা ২৫ বছরেও গৃহীত হয় নি। অথচ এটা কার্যে পরিণত করা হলে উত্তরাঞ্চল থেকে অভিবাসনের জন্য যে বহু কোটি রুবল খরচা হয় সেটা বেঁচে যেত। কেন এমন ঘটে—এই ধাঁধার উত্তর দিতে গিয়ে ভাদিম বুজিচকিন একটি অতি সরল কিন্তু অসাধারণ বাস্তবসম্মত মন্তব্য করেছেন: বেশির ভাগ আমলার কাছে কোনো কাজ করার চাইতে না করাই সহজ।

প্রতি বৎসর সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপুলসংখ্যক আবিষ্কারের পেটেন্ট নেওয়া হয়। এই সংখ্যা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি, আর জাপানের সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ। অন্যান্য দেশের মতো সোভিয়েত ইউনিয়নেও আমলারা সাধারণত ঝুঁকি এড়িয়ে চলেন, এবং তাঁরা অবাস্তব আদিম নিয়মকানুন অন্ধভাবে অনুসরণে আগ্রহী। অতএব, আবিষ্কার প্রয়োগে তাঁদের উৎসাহ প্রায় নেই। পক্ষান্তরে, জাপানে বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে (সোভিয়েত ইউনিয়নের ছাঁচে) পার্টির আমলাবর্গ তো প্রায় অনুপস্থিত, আর জনহিতকর আবিষ্কার নষ্ট করার ক্ষমতা সরকারি আমলাদের নেই বললেই চলে। আজ তাই সোভিয়েত জনগণ এই ভাবনায় বিস্মিত-বিহ্বল—পেরেসত্রোইকার আগে এই ভাবনা ব্যক্ত করাও ছিল রাষ্ট্রদ্রোহ—যে তাঁদের দেশে যদি পার্টির আর সরকারের আমলাদের সব ব্যাপারে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা না থাকত, এবং তাঁদের সব আবিষ্কারগুলির যথাযথ প্রয়োগ ঘটত, তাহলে তাঁদের প্রযুক্তি ও অর্থনীতির কী অপরিসীম প্রগতি দেখা যেত। সৌভাগ্যক্রমে, সোভিয়েত আমলারা অগণিত আবিষ্কার ধ্বংস করলেও, সাধারণ মানুষের উদ্ভাবনী-শক্তি বিনষ্ট করতে পারেন নি। কিন্তু কেবলমাত্র আবিষ্কারের সু-উচ্চ স্তরেই নয়, তুলনায় নিম্নস্তরেও, প্রাক্-পুনর্গঠন যুগে অবাস্তব রীতিনীতির প্রতি আমলাদের অনমনীয় আস্থার জন্য অর্থনীতিতে এক ধরনের অকথিত বিপর্যয় দিনে-দিনে প্রকট হচ্ছিল। কর্মনিরপেক্ষ বেতনসমতার প্রতি আমলাদের অবিচল আসক্তির জন্য উদ্যম এবং নেতৃত্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল। উদাহরণস্বরূপ, যাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে বিশারদ, এবং উচ্চতর পদের জন্য যোগ্য, তাঁরা পদোন্নতির আকাঙ্ক্ষা

অনেক সময়েই দেখাতেন না, কারণ মহত্তর কাজ এবং দায়িত্বের সঙ্গে বেতনের কোনো সামঞ্জস্য ছিল না।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে কেউ যেন এরকম কোনো উদ্ভট সিদ্ধান্তে না আসেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতিকে হেয় করার চেষ্টা হয়েছে। ওই বিশ্লেষণে এবং বিভিন্ন সোভিয়েত পত্রপত্রিকায় পুনর্গঠনের উদ্যোক্তারা যা লিখেছেন—তাতে একথাই জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের অতুলনীয় সম্পদ অনুযায়ী যে আর্থিক প্রগতি হওয়া উচিত ছিল, এবং বাস্তবে যা ঘটেছে, তার ব্যবধান অপরিমেয়। ওই ব্যবধান ঘোচাবার জন্য, প্রাক্-পুনর্গঠন যুগের যে গলদগুলি আমলাবর্গের অবদান, সেগুলিকে বর্জন করার চেষ্টা চলেছে। প্রসঙ্গত, আলেকজানদার ভাসিনস্কির একটি সরস মন্তব্য মনে আসে: কিছু না কিছু অগ্রগতি প্রায় সব সময়েই হয়—যখন সামগ্রিক-ভাবে দেশে অচলাবস্থা অনুভূত হয়, তখনও কিছু কাজ চলে, যখন সারা দেশ সংকটাবস্থার প্রায় নিকটবর্তী, তখনও কাজ হয়। কিছু যন্ত্রপাতি সচল থাকে; চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোয়, জমিতে ফসল আসে; রকেটও মহাকাশে ভ্রমণ করে—জীবন তো সচলই থাকে।

আমলাবর্গের বহুবিধ মজ্জাগত বদভ্যাসকে একত্রিত করে আমলাতান্ত্রিকতা (ব্যুরোক্রেটিজম) আখ্যা দেওয়া যায়। এই শব্দটি সোভিয়েত ইউনিয়নে যত বহুল-প্রচলিত, ততটা বোধহয় আর কোথাও নয়। মনে রাখতে হবে যে, আমলাতান্ত্রিকতা আবার অতিকেন্দ্রীকরণের শ্রেষ্ঠ সখা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো অস্বাভাবিক অবস্থায় অতিকেন্দ্রীকরণ সাধারণ মানুষের উপকারে লাগে, কারণ কিছু বিশেষ পদক্ষেপ দ্রুত নেওয়া যায়। কিন্তু স্বাভাবিক সময়ে অতি-কেন্দ্রীকরণের কুফল বিষম এবং বহুবিধ। এগুলি হল: ক্ষমতাজনিত মনোবিকার, শীর্ষতম নেতাদের স্বৈরাচারী ইচ্ছাপূরণের জন্যে অধস্তনদের লজ্জাকর আত্মসমর্পণ, এবং যথাযথ বিচার-বিবেচনা না করে

বিশাল-বিশাল বাঁধের মতো চমকপ্রদ প্রকল্প গ্রহণ, যাতে ক্ষমতা প্রদর্শনের লালসা চরিতার্থ হয় বটে, কিন্তু দীর্ঘকালীন পরিবেশগত ক্ষতি হয় অপূরণীয়।

প্রসঙ্গত বারংবার স্মরণ করা উচিত যে লেনিন এই ধরনের আমলাতান্ত্রিকতা এবং অতিকেন্দ্রীকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আধুনিক ইতিহাসে লেনিন বোধহয় সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ তাত্ত্বিক, যিনি তত্ত্বের ভিত্তিতে অভূতপূর্ব সমাজবাদী পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন, অতি দ্রুত স্বকীয় অভিজ্ঞতা থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নেন, এবং তাঁর অতুলনীয় মননশীলতা দ্বারা তত্ত্ব ও কার্যক্ষেত্রে তত্ত্বের প্রয়োগ—দুয়েরই পুনর্বিন্যাস করেন। সমাজবাদী অর্থনীতির বাস্তব সংগঠনের অদৃশ্য সমস্যাবলী মার্কস-এঙ্গেলস বিশদভাবে আলোচনা করেন নি। লেনিনের একটি প্রধান মানসিক সম্পদ ছিল সত্যনিষ্ঠা। বিপ্লবের অব্যবহিত পরে যুদ্ধকালীন কমিউনিজমের অভিজ্ঞতার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন তিনি সত্বর করে ফেলতে পেরেছিলেন, যদিও ওই সময়ের ভুলভ্রান্তি চিহ্নিতকরণ শীর্ষতম নেতা হিসেবে তাঁর কাছে মোটেও সুখকর ছিল না। লেনিন নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছিলেন যে যুদ্ধকালীন কমিউনিজমের সময়ে বলপূর্বক কৃষকদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য আদায়, এবং ব্যবসাবাণিজ্যকে দেশব্যাপী খাদ্য রেশন-বণ্টন-ব্যবস্থায় রূপান্তর, এগুলি ছিল ভ্রান্ত পদক্ষেপ। তিনি মেনে নেন যে প্রতিটি মানুষকে বা কারখানাকে যা সরবরাহ করা হবে, সবকিছুই কেন্দ্রভূত বণ্টন-ব্যবস্থার মারফত করতে হবে, এটা ছিল সমাজবাদ সম্পর্কে প্রমাদপূর্ণ ধারণার পরিচায়ক। লেনিন স্পষ্টই লিখেছেন, এসব ভুল নীতির ফলে সোভিয়েত বিপ্লবীরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের শিকার হন, তা ছিল প্রতিবিপ্লবীদের সফল আক্রমণ-গুলি থেকেও অনেক বেশি বিপজ্জনক।

কেউ-কেউ লেনিনের নোতুন অর্থনৈতিক নীতি বা "নেপ"-এর কদর্থ করে বলেন যে, বেসরকারি উদ্যোগকে স্বল্পকালীন সুযোগসুবিধা দেওয়াই ছিল

"নেপ"-এর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। বস্তুত, "নেপ"-এর কেন্দ্রস্থলে ছিল সাধারণ মানুষের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সমাজবাদী অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন। "নেপ" তাই যেমন ব্যক্তিকে আর্থিক উৎসাহদানের অন্তর্নিহিত গুরুত্ব স্বীকার করেছিল, তেমনি রাষ্ট্রীয় শিল্পোদ্যোগে আর্থিক স্বাবলম্বনের ওপরও জোর দিয়েছিল। সাধারণ মানুষ যেন সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তাঁরা যেমন কাজের জন্য ন্যায্য মজুরি বা বেতন পাচ্ছেন, তেমনি ক্রেতা হিসেবে তাঁদের উচিত-স্বার্থসাধনেও সরকার সদাই তৎপর। তাই, অতি সংক্ষেপে বলা যায়, "নেপ"-এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল ব্যবসা-বাণিজ্য-কে এবং দ্রব্য-মুদ্রা-সম্পর্ককে অর্থনীতিতে যথার্থ স্থান দেওয়া, এবং অকর্মণ্য সরকারি উদ্যোগগুলির ঋণভার থেকে রাষ্ট্রের কোষাগারকে মুক্ত করা। যে ভাবপ্রবণ সমাজবাদ সমাজের বাস্তব সমস্যাকে অবজ্ঞা ক'রে মনগড়া আদর্শের স্বপ্নলোকে বিচরণ করে, লেনিন ছিলেন তার বিরোধী। ঐ ভাবপ্রবণ সমাজবাদ থেকেই জন্ম নেয় আমলাতান্ত্রিক কল্পরাজ্য, যেখানে ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত স্বার্থের পরোয়া না করে ব্যক্তিকে চিন্তা-শক্তিহীন আমলাদের স্বেচ্ছাচারী হুকুম প্রশ্নাতীতভাবে পালনের যন্ত্রে পর্যবসিত করা হয়।

কিন্তু লেনিন যেমন বাস্তব অবস্থা ও অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাত্ত্বিক ভাবনা বা আদর্শ-গত রূপকল্প পরিত্যাগ বা পরিবর্তন করতে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁর কোনো-কোনো সহকর্মীর এতে সম্মতি ছিল না। এই সহকর্মীরা যুদ্ধকালীন কমিউনিজমের সময়ে অবাধ কর্তৃত্ব ভোগ করে অত্যন্ত ক্ষমতালোভী হয়ে পড়েন, এমনকী নিজেদের অপ্রতিহত আধি-পত্যের জাহুতেও তাঁরা বিকারগ্রস্ত বিশ্বাস স্থাপন করে বসেন। অথচ ওই নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের ব্যবহারে দেশে যে সঙ্কট এসেছিল, সেটাও তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যেমন তাঁরা এটাও দেখেছিলেন যে লেনিনের "নেপ" ওই সঙ্কট দূর করেছিল। কিন্তু ক্ষমতার লালসায় আচ্ছন্ন ওই নেতারা লেনিনের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরই 'নেপ' বাতিল করেন। এই নীতি পরিবর্তনের অবধারিত কুফল ১৯৩০-এর দশকে প্রকট হল। গ্রামাঞ্চলে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। আর শহরে বিদ্যমান বিশাল ও জটিল পরিসেবাশিল্প হয় ভেঙে পড়ল, নতুবা তাতে অসহ্য ত্রুটিবিচ্যুতির সৃষ্টি হল। কিন্তু এসব কুফল তো কেবল সাধারণ মানুষকেই ব্যতিব্যস্ত করল। যাঁরা পার্টির বা সরকারের পদস্থ আমলা, তাঁরা দৈনন্দিন জীবনের বিবিধ সমস্যা থেকে মুক্ত ছিলেন; তাঁরা কর্তৃত্বের অপপ্রয়োগ মারফত নিজেদের জন্য বিশেষ সুবিধা সংরক্ষণে সফল ছিলেন। এই স্পষ্টত অন্যায্য সমাজব্যবস্থার সমর্থনে একটি উদ্ভট তত্ত্বও খাড়া করা হল: বলা হল যে দ্রব্য-মুদ্রা সম্পর্ক একটি ধনতান্ত্রিক আবর্জনা। সুদীর্ঘকাল এই তত্ত্বকে জীবন্ত রাখা হল। ১৯৫০-এর দশকের প্রথমে 'ইকনমিক প্রবলেমস অব সোশ্যালিজম ইন দি ইউ-এস-এস-আর' গ্রন্থেও দ্রব্য-মুদ্রা সম্পর্কের বিরোধিতা করা হয়। এর কারণও সহজবোধ্য: ওই সম্পর্ক স্বীকার করলে ক্রেতা-বিক্রেতার স্বাধীন পছন্দের অধিকার মেনে নিতে হয়। আর ওই অধিকার বজায় রাখলে কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় আমলাবর্গের যে বিশেষ সুবিধাগুলি আয়ত্তে থাকে, সেগুলি হাতছাড়া হয়ে যায়। কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য, এবং যৌথ খামারগুলিকে সরকারি খামারে রূপান্তরিত করার জন্য, স্তালিন বাস্তব অবস্থাকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে বলেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের যৌথ-খামারগুলি পাশ্চাত্য দেশের বাণিজ্যিক সমবায়গুলির সঙ্গে তুলনীয়। যে সময়ে স্তালিন এই কথা বলেছিলেন তখন তাঁর দেশে যৌথ খামারের ওপর সরকারের কর্তৃত্ব ছিল এতই ব্যাপক যে যৌথ খামারে কী শস্য ফলানো হবে, এবং কী দামে তা সরকারি সংগ্রহ-কেন্দ্রে বাধ্যতামূলকভাবে জমা দিতে হবে, সবই নির্ভর করত সরকারি আদেশের ওপর। আর ওই আদেশ ছিল এমন স্বেচ্ছাচারী আর অবাস্তব যে শস্যের দাম যা দেওয়া হত তাতে খামার

থেকে সরকারি সংগ্রহকেন্দ্রে শস্যপরিবহণের খরচাও উঠত না।

মহাশক্তিমান সোভিয়েত অর্থনীতি যে তার শক্তির একটি ক্ষুদ্র অংশ জনতার সেবায় নিয়োগ করতে পেরেছিল এবং সোভিয়েত জনগণ যে সুদীর্ঘকাল তাঁদের সহজপ্রাপ্য জীবনযাত্রার মানের তুলনায় নিতান্ত নিম্ন মানে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার মূলে ছিল এই অলীক তত্ত্ব এবং অবাস্তব কার্য-কলাপ। ভোগ্যবস্তুর বা উৎপাদনের উপায় উৎপাদন, সর্বক্ষেত্রেই, একটি প্রকৃত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের তুলনায় তারই পাশাপাশি একটি গুপ্ত উদ্যোগ অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করে। দৃষ্টান্ত: একটি কারখানায় ১০০ জোড়া জুতো তৈরি করার জন্য স্থিতিস্থাপক চামড়া দেওয়া হল। তা থেকে ২০০ জোড়া প্রস্তুত হল, এবং বাড়তি উৎপাদন ঐ কারখানার কর্মীদের জন্য কালো-বাজারে যে বেসরকারি আয় সৃষ্টি করল, তা কর্মীদের নথিবদ্ধ সরকারি রোজগারের তুলনায় অনেক বেশি। সরকারি ভবনে নির্মাণ-কাজ যেখানে চলেছে, সেখান থেকে বিপুলপরিমাণ মালমশলা পাচার হয়ে যায় ব্যক্তিগত বাড়িঘর বা গ্রীষ্মাবাস নির্মাণের জন্য। কেন্দ্রী-ভূত নিয়ন্ত্রণ আর তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে যেসব বিদ্বেষনাহীন নির্দেশনামা বেরোয়, তার ফলে কৃষকেরা বাধ্য হয় সেই জমিতে গোপালন করতে যা গম চাষের উপযোগী। পক্ষান্তরে, অনেক সময় তারা গম উৎপাদনে বাধ্য হয় সেই জমিতে, যা গোচারণের পক্ষে প্রকৃষ্ট। যেসব এলাকায় ফল আর সবজির বিপুল উদ্বৃত্ত আছে, সেখানকার কৃষিজীবীদের বাধ্য করা হয় নিজেদের এলাকায় তাদের বিক্রয় সীমাবদ্ধ রাখতে, যদিও তার জন্য শতকরা ৫০ ভাগ ফল-সবজি পচে যায়, অথবা পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যেসব এলাকায় ফল-সবজির ঘাটতি আছে, সেখানে ওগুলি বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। এভাবেই প্রাক্-পেরেসত্রোইকা যুগে বাণিজ্য আর বাজার ব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক পাপ হিসেবে চিহ্নিত করে আমলাদের ক্ষমতালিপ্সা আর সর্বজ্ঞতার দম্ভ চরিতার্থ করা হত।

প্রকৃতপক্ষে ঐ ক্ষমতা-বুভুক্ষু সুবিধাসক্ত আমলারা যেটা বিস্মৃত হয়েছিলেন সেটা হল, সমাজবাদী ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কার্যকরতা বিশদ-ভাবে পরীক্ষা করার অধিকার সাধারণ মানুষের আছে, এবং বাজার মারফত যে পরীক্ষা চলে সেটি আসলে সাধারণ মানুষের দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষা। উপরন্তু, সমাজবাদী দেশে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় যোগদানের অধিকার সাধারণ ক্রেতা বা ভোক্তার আছে, এবং বাজারের শক্তিপ্রবাহকে সচল থাকতে দিলে ওই অধিকারই প্রয়োগ করা হয়। বাজারের শক্তিসমূহকে যথাযথ মর্যাদা বা স্বীকৃতি না দিলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনারই অবমূল্যায়ন বা বিকৃতি ঘটে। কারণ, পরিকল্পনার মাপকাঠিগুলি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে, আর সরকারি নির্দেশগুলি হয়ে যায় দায়িত্বজ্ঞানহীন। যখন বাজার মারফত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফলাফল যাচাই করার সুযোগ থাকে না, তখন ব্যয়ের পরিমাণ আর ফলাফলের মধ্যে বিভ্রান্তি-কর সমার্থতা সৃষ্টি করা হয়। যখন কেন্দ্রীয় স্তরে পরিকল্পনার অধিকর্তারা সমস্ত ক্ষমতা জবরদখল করে বিশদ অপরিবর্তনীয় নির্দেশনামা প্রেরণ করেন, এবং স্থানীয় স্তরে বিকল্প কর্মসূচী বা কার্যপ্রণালী প্রণয়নের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন নোভোজিলোভের ভাষায়, মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় কাল্পনিক ফলাফল ও নিম্নমানের দ্রব্যাদির পশ্চাদ্ধাবন করে। অথবা, গ্লেব করঝিঝানভস্কির কথায় (যিনি ১৯২৯ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর উপ-সভাপতি ছিলেন), এমন সব দায়িত্ববিবর্জিত শিল্পপ্রকল্প প্রস্তুত করা হয়, যেগুলির রচয়িতাদের সদিচ্ছা যদি বা থাকে, অর্থনৈতিক দিক থেকে সেগুলি ভিত্তিহীন। এভাবে, সর্বাধিক খরচা থেকে আসে সর্বনিম্ন ফলাফল। কিন্তু যদি (অতীতে প্রাক-পেরেসত্রোইকা সময়ে) নোভোজিলোভের পরামর্শ অনুসারে কেন্দ্রীয় স্তরে পরিকল্পনার কর্তা-

ব্যক্তিরা মৌলিক নীতি-নির্দেশ সাধারণভাবে বা নমনীয়ভাবে প্রণয়ন করে স্থানীয় স্তরে প্রেরণ করতেন, এবং স্থানীয় স্তরে সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের এই স্বাধীনতা দিতেন যে তাঁরা বাজারনির্ভর বিকল্পগুলি রচনা ও পছন্দ করতে পারবেন, তাহলে ন্যূনতম ব্যয়ে মহত্তম ফলাফল লাভ করা যেত।

যদি ভোক্তাকে, বা জনসাধারণকে, বা বাজারকে, অবজ্ঞা করা হয়, তাহলে, নোভোজিলোভের কথায়, একদিকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও অপরদিকে ব্যয় সম্পর্কে দায়িত্ব (বা আর্থিক আত্মনির্ভরতা)—এই দুইয়ের মধ্যে বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়। এর ফলে বাম-পন্থী কমিউনিজমের পুনরুজ্জীবনের মতো মারাত্মক বিপদ দেখা দেয়। আর আমলাবর্গ তো একটি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ, মূল্য, ওই উদ্যোগে কোথা থেকে মালপত্র সরবরাহ হবে, কারা ওই উদ্যোগের উৎপাদন কিনবে, ইত্যাদি—সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখবেন, কিন্তু সিদ্ধান্তের শুভাশুভর কোনো দায়িত্ব তাঁরা বহন করবেন না। সাধারণ কৃষক বা শ্রমিকেরও খানিকটা দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়। কিন্তু আমলাবর্গের নিবাস দায়িত্বশূন্য স্বর্গরাজ্যে। নোভোজিলোভের কিন্তু (প্রাক-গ্লাসনস্ত যুগেও) এতটা সাহস ও সত্যনিষ্ঠা ছিল যে তিনি লিখেছিলেন, কৃষিজীবী আর কারখানার শ্রমিকদের মতো বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে টেবিল-বন্দী আমলাদেরও আর্থিক দায়িত্ব-শীলতার প্রমাণ দেওয়া উচিত; তাঁদের আয়কেও হতে হবে উপার্জিত আয়; বিনা দায়িত্বে নির্দিষ্ট বেতন ভোগ তাঁদের আর করা চলবে না। একমাত্র ওই অবস্থাতেই আমলারা প্রয়োজনীয় দায়িত্বশীলতা প্রদর্শন করে তেমন-তেমন সিদ্ধান্ত নেবেন, যার ফলে তাঁদের নিয়ন্ত্রণভুক্ত উদ্যোগসমূহের কর্মক্ষমতা বাড়বে, তাঁরা আর এমনভাবে কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করবেন না, যার ফলে সেখান মানুষের উদ্যম, উদ্ভাবনীশক্তি আর নেতৃত্বপ্রদানের ক্ষমতা অপচয়িত হয়। বর্তমান পৃথিবীতে প্রযুক্তির অগ্রাভিযান এত দুর্বার গতিতে চলেছে যে উপরোক্ত মানবিক গুণাবলীর অভাব ঘটলে দেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার টিঁকে থাকা দুরূহ হয়ে ওঠে।

যখন একটি সমাজবাদী অর্থনীতি (যেমন চীনে বা সোভিয়েত ইউনিয়নে) পুনর্গঠন বরণ করে নেয়, এবং সেজন্য বাজারের শক্তিসমূহের ওপর প্রয়োজনীয় আস্থা স্থাপন ক'রে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অপচয় হ্রাসের প্রয়াস নেয়, তখন কিন্তু সেখানে এসব করা হয় পরিকল্পিত অর্থনীতি ও উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানার সামগ্রিক কাঠামোর অভ্যন্তরে। দ্রব্য-মুদ্রা-সম্পর্কের যে তাৎপর্য আছে সমাজবাদী অর্থনীতিতে, সে তাৎপর্য মূলধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে নেই। লাভ, ভাড়া, ইত্যাদির প্রকৃতি সমাজবাদী আর মূলধনশাসিত অর্থনীতিতে এক নয়। অর্থনীতি-বিদ নিকোলাই পেত্রাকভ লিখেছেন: এই পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে অনুধাবন করতে হবে কারা, এবং কী উদ্দেশ্যে, আর্থিক-সামাজিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করছেন। একটি মূলধনশাসিত অর্থনীতিতে যেমন সম্পূর্ণ মুক্ত বাজার থাকে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ধনতান্ত্রিক চরিত্র বিনষ্ট হয় না, তেমনি একটি সমাজবাদী অর্থনীতিতে পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা চালু না থাকলেই তার সমাজবাদী চরিত্র অবলুপ্ত হয় না। "ক্যাপিটাল" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে কার্ল মার্কস লিখেছিলেন, মূলধন-তন্ত্রের আমলে কিছু-কিছু ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করে, এবং সমাজবাদী আমলে ওগুলি মূলধনতন্ত্রের আমলের ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে মুক্ত হয়। পেরেসত্রোইকার সমর্থকেরা মার্কসের এই বক্তব্য সঙ্গত কারণেই স্মরণ করছেন।

দুই

রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সংস্কার

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পুনর্নবীকরণের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য দিক হল রাজনৈতিক-প্রশাসনিক। এই প্রবন্ধের প্রথমাংশের আলোচনা থেকে এটা মোটামুটি স্পষ্ট যে, রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সংস্কার মারফত পার্টির আর সরকারের আমলাবর্গের ক্ষমতা আর কার্যাবলী ব্যাপকহারে না কমালে, বা সেগুলির পুনর্বিন্যাস না করলে, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সফল হবে না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন অর্থনীতির গণতন্ত্রী-করণের ওপর নির্ভরশীল, তেমনি অর্থনীতিতে গণতন্ত্র প্রবর্তন রাজনীতি ও প্রশাসনের গণতন্ত্রায়নের ওপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা সহজেই অনুধাবন করা যাবে যদি আমরা বহু উদাহরণের মধ্যে কয়েকটি পর্যবেক্ষণ করি, যা থেকে বোঝা যাবে যে আমলা-বর্গের একাংশ অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে বাধা দিচ্ছেন—কখনও সূক্ষ্ম, কখনও স্থূল উপায়ে। এখনও অনেক আমলা আছেন, যাঁরা জনসাধারণের অত্যাবশ্যক চাহিদা মেটানোর পরিবর্তে নিজের দম্ভ আর ভোগ-লালসা চরিতার্থ করাকেই অগ্রাধিকার দেন, এবং অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ, বিলাসবহুল বিশ্রামভবন বা শিকারগৃহ নির্মাণ করেন। সেখানে বিলিয়ার্ড খেলার ঘর, 'সনা'-স্নানাগার, বহুমূল্য ঝাড়লণ্ঠন ইত্যাদি অনেক বন্দোবস্ত থাকে।

আমলাতন্ত্রের পক্ষ থেকে পুনর্গঠনের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠেছে। আপত্তি এই রকমের—পুনর্গঠনের ফলে একটি কৃষিজীবী পরিবার চুক্তিব্যবস্থা অবলম্বন করে কঠোর পরিশ্রম দ্বারা বার্ষিক আয় উল্লেখযোগ্য-ভাবে বাড়ালেন। যে আয় প্রচণ্ড পরিশ্রম মারফত উপার্জিত, সেই আয়ের অধিকারীকে অর্থপিশাচ বলা যায় না। কিন্তু পুনর্গঠন-বিরোধী আমলারা এই পরিশ্রমী ব্যক্তিদের অন্যায়ভাবে অর্থলাভী হিসেবে চিহ্নিত করছেন—অবশ্য এটা তাঁরা করছেন গোপন রটনায়। প্রকাশ্যে এটা না করার চাতুর্য আমলাদের আছে। শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা যখন পেরেস-ত্রোইকার সপক্ষে বক্তৃতা দেন, তখন ওই আমলারাই হর্ষধ্বনি দেন। কার্যক্ষেত্রেও আমলারা এই ধরনের দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করেন। যখন কোনো একটি সমবায় উদ্যোগ অপরাপর কারখানার বর্জিত পদার্থ থেকে এমন একটি দ্রব্য উৎপাদনের প্রকল্প প্রস্তুত করেন যা বৈদেশিকমুদ্রার সাশ্রয় ঘটাবে এবং পরিবেশ রক্ষা করবে, তখন আমলারা ঐ সমবায়কে পুনর্গঠনের পথিকৃৎ বলে প্রশংসা করবে না। কিন্তু, বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও, এবং জমির কোনো অভাব না থাকলেও, আমলারা ঐ সমবায়কে জমিমণ্টনে অযথা বাধা-বিলম্বের সৃষ্টি করেন। অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র রাখার কাজ—যার গুরুভার কেবল বহুসংখ্যক ব্যবস্থাপনার কর্মী নিয়োগকারী উদ্যোগই বহন করতে পারে—সেই কাজ ছোটোখাটো সমবায়ের ওপরও আমলারা চাপিয়ে দেন। ওই সমবায় যদি ব্যবহৃত পদার্থের পুনর্ব্যবহার করে টিনের মতো দুষ্প্রাপ্য ধাতু তৈরির প্রকল্পও গ্রহণ করে থাকে, তাহলেও সব আমলাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করা যায় না। কোনো কোনো আমলা ব্যক্তিগত উদ্যোগ সংক্রান্ত আইনেরও এমন অপব্যাখ্যা দেন যে একজন উদ্যমী ব্যক্তি কাগজ-পত্র তৈরির কাজেই প্রায় ডুবে যান, অথচ ওই কাগজ-পত্র প্রস্তুতের কাজ প্রায় পুরোটাই পরিহার্য। এভাবে এখনও পর্যন্ত কিছু-কিছু আমলা পেরেসত্রোইকাকে মৌখিক সমর্থন জানিয়ে কার্যক্ষেত্রে তাতে বাধা দিচ্ছেন।

এই প্রসঙ্গে আমলাবর্গ সম্পর্কে মার্কসের একটি বক্রোক্তি প্রণিধানযোগ্য: আমলাবর্গের উচ্চ ও নিম্ন স্তরের ভেদাভেদের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয় তাঁদের বিদ্যাবত্তা; কোনো বিষয়ের বিশদ ব্যাপারগুলি অনুধাবনের দায়িত্ব উচ্চপদস্থ আমলারা নিম্নপদস্থদের ওপর দেন, আর সমগ্র বিষয়টি বোঝার দায়িত্ব যে উচ্চপদস্থ আমলাদের, সেটা নিম্নপদস্থরা মেনে নেন,

এবং এভাবে সব আমলারাই প্রতারিত হন। এ যুগের রাজনৈতিক-ভাষ্যকার লিওনিদ লিখোদেয়েভ লিখেছেন, কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে সব আমলারা মনে করেন তাঁরা সবজান্তা, এবং সব সময়েই তাঁরা ঠিক করেন। অ্যাকাডেমিসিয়ান ভ্লাদিমির সোকোলোভের লেখা থেকে জানা যায়, কয়েকজন সোভিয়েত আমলা একবার দাবি করলেন যে জাতীয় উদ্যানগুলি থেকে লাভ আসা উচিত। পরিবেশ সংরক্ষণে কী গভীর অনাসক্তি থাকলে আমলারা এই ধরনের উদ্ভট দাবি তুলতে পারেন, তা সহজ-বোধ্য। কারণ, সোভিয়েত ইউনিয়নে শতকরা মাত্র এক ভাগ জমি সরকার সংরক্ষণের আওতায় এনেছেন, আর জাপানে এর পরিমাণ শতকরা আঠারো ভাগ, যদিও জাপানে জনবসতির ঘনত্ব অনেক বেশি—অতএব জাপানে জাতীয় উদ্যান ইত্যাদি স্থাপন করা সোভিয়েত দেশের তুলনায় অনেক বেশি কঠিন। উপরন্তু, মূলধনশাসিত দেশগুলিতেও জাতীয় উদ্যান বিপুল-পরিমাণ ভরতুকির ওপর নির্ভরশীল। তাই উপরোক্ত সোভিয়েত আমলারা যখন জাতীয় উদ্যানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান করতে চাইলেন, তখন তাঁদের বক্তব্য শুধু সমাজবাদ-বিরোধী নয়, প্রায় অসামাজিক পর্যায়ে চলে গেল। বিশেষত, ওই আমলাদের সহ-কর্মীকে যেখানে যুগের পর যুগ অগণিত শিল্পোদ্যোগ ক্ষতিতে চালাচ্ছেন, সেখানে জাতীয় উদ্যানের ওপর এই বিধিনিষেধ আরোপের চেষ্টা আমলাদের অজ্ঞতা আর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার একটি অনুপম দৃষ্টান্ত। তা ছাড়া, ছোটোখাটো কর্মসূচীও—যেমন একটি প্রকৌশল কারখানার স্বাস্থ্য কর্মসূচী—আমলাবর্গের আবিষ্কৃত নানা নির্দেশ (ও বিধিনিষেধ) লঙ্ঘন না করে চালানো যায় না। সোভিয়েত ইউনিয়নে তৈলশোধন ও পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের মন্ত্রী নিকোলাই লেমায়েভ অতীতে দুই দশকেরও বেশি সময় একটি পেট্রোকেমিক্যাল কারখানার পরিচালক ছিলেন। ওই কারখানার কাজ তিনিই শুরু করেন, এবং তাঁর পরিচালনায় কালক্রমে ওই কারখানা পেট্রোক্যামিক্যাল শিল্পের ২০০ উদ্যোগের মধ্যে বৃহত্তম স্থান অধিকার করে। স্বয়ং লেমায়েভ অকপটে ব্যক্ত করেছেন যে সোভিয়েত অর্থনীতি প্রায় ২ লক্ষ আমলাতান্ত্রিক নির্দেশের ভারে ন্যুব্জ, এবং বেশির-ভাগ নির্দেশই বহুকাল পূর্বে বাতিল করা উচিত ছিল; তা ছাড়া, তিনি যে কারখানা-পরিচালক হিসেবে তাঁর কর্তব্য সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন, তার একটি প্রধান কারণ তিনি অগণিত নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছিলেন।

লিখোদেয়েভ একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, আমলাদের এক অসাধারণ ক্ষমতা হল যে তাঁরা তাঁদের ঔদ্ধত্য আর প্রকৃত জ্ঞানকে সমতুল্য মনে করতে পারেন। উৎপাদন-ও বণ্টন-ব্যবস্থায় অতিকেন্দ্রীকরণের ক্ষমতার নেশায় মত্ত আমলাদের বৈরাচারী নির্দেশগুলিকে জোরদার করে—আবার, এসব নির্দেশও অতিকেন্দ্রী-করণকে অধিকতর দৃঢ়মূল করে। ফলে, কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিই হোক বা ভোগ্যপণ্যই হোক, প্রায় সব দ্রব্যেরই একটানা ঘাটতি লেগেই থাকে। ভাগ্যহীন ভোগ্যপণ্যক্রেতাদের কথা যদি ছেড়েও দেওয়া যায়, বহু উদ্যোগে বিবেকবান কর্মী আর ব্যবস্থাপকেরা এক শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হন। আইন ও অনীতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, সৃষ্টি হয় নতুন ধরনের ব্যক্তির, যাঁদের (আলেক-জান্দার বোরিন-এর ভাষায়) 'নিঃস্বার্থ অপরাধী' আখ্যা দেওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মস্কোর এক কার-খানার প্রধান প্রকৌশলী দেখলেন যে, তাঁর একটি সিমেন্ট পাম্প শীঘ্র প্রয়োজন। স্বাভাবিক উৎস থেকে ওই পাম্প পাওয়া অসম্ভব, অতএব সমগ্র কারখানার উৎপাদনই স্তব্ধ হয়ে যাবে। কারখানা চালু রাখার জন্য একটি পথই খোলা ছিল: পার্শ্ববর্তী এক কার-খানায় একটি অপ্রয়োজনীয় সিমেনট পাম্প অলস অবস্থায় ছিল, এবং ওই কারখানার এক কর্মীকে উৎকোচ দিয়ে পাম্পটি জোগাড় করা যায়। এই পথ

অবলম্বন করে উপরোক্ত প্রধান প্রকৌশলী তাঁর উদ্যোগ চালু রাখলেন, যদিও এতে তাঁর কোনো ক্ষুদ্র বা গোপন ব্যক্তিগত সুবিধা জড়িত ছিল না। দুর্ভাগ্য-ক্রমে, ভবিষ্যতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, আর বিচারে তাঁর কারাবাস হয়। কিন্তু যেটা মনে রাখা উচিত সেটা হল যে উক্ত প্রকৌশলীর মতো অনেক নিঃস্বার্থ আইনভঙ্গকারীই ধরা পড়েন না, এবং সেজন্যই অসঙ্গত আমলাতান্ত্রিক বিধিনিষেধ সত্ত্বেও অনেক উদ্যোগ চালু থাকে। আরও যেটা মনে রাখা অবশ্য-কর্তব্য, সেটা হল, যন্ত্রপাতি বা ভোগ্যপণ্যের নিরন্তর ঘাটতির জন্য দায়ী যেসব ক্ষমতাশালী আমলারা (এবং তাঁদের অযৌক্তিক নির্দেশাবলী), সেই আমলাদের কিন্তু ঘাটতির জন্য কোনো অসুবিধা সহ্য করতে হয় না। কারণ, তাঁরা সব ব্যাপারেই বিশেষ সুবিধার অধিকারী: তাঁদের জন্য সংরক্ষিত খাদ্যদ্রব্যের দোকানে কোনো কিছুর অভাব নেই; তাঁদের জন্য স্বল্প অথবা বিনা মূল্যে পাওয়া যায় বিলাসবহুল আবাসগৃহ, উচ্চমানের হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, এবং চালকসমেত মোটরগাড়ি এখনকী বিমান, রেল, থিয়েটার, সিনেমার টিকিটের জন্যও আছে পৃথক নির্ঝঞ্ঝাট বন্দোবস্ত। উপরন্তু, আমলা-সৃষ্ট ঘাটতির ওপর নির্ভরশীল যে কালোবাজার, তা থেকেও অনেক আমলা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। প্রাক্-পেরেস-ত্রোইকা যুগে এসব উচ্চপদস্থ লুটেরাদের শাস্তি হওয়া ছিল প্রায় অভাবনীয়। পেরেসত্রোইকার আমলে এঁদের অনেকেই শাস্তি পাচ্ছেন।

যে বহুস্তরবিশিষ্ট আমলাবর্গ সমাজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর, যাঁরা কাল্পনিক কাজ-কর্মেই পারদর্শী, তাঁদের সংখ্যা আর ক্ষমতা হ্রাস করা সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র পুনর্নবীকরণের একটি প্রধান পূর্বশর্ত, একটি অপরিহার্য অঙ্গ। উনবিংশ পার্টি কনফারেন্সে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর মুরমানস্ক বক্তৃতায় গোরবাচেভ খেদোক্তি করেছিলেন যে সারা দেশে আমলার সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ। (দেশের জনসংখ্যা প্রায় ২৮ কোটি ১০ লক্ষ।) ইউনিয়ন (বা কেন্দ্রীয়) স্তরে মন্ত্রণালয় ইত্যাদির সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে হয়েছিল ১০০, আর পরবর্তী বা রিপাবলিক স্তরে ৮০০। পেরেসত্রোইকার ফলে ইতিমধ্যে কতকগুলি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ তুলে দেওয়া হয়েছে। আর ১৯৮৮ সালের ২৮ জুন গোরবাচেভ তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে, ক্রমে-ক্রমে ইউনিয়ন স্তরে শতকরা ৪০ ভাগ সরকারি দফতর লুপ্ত হয়ে যাবে; অনুরূপভাবে নিম্নবর্তী বিভিন্ন স্তরে শতকরা ৩৩ থেকে ৫০ ভাগ সরকারি দফতর তুলে দেওয়া হবে।

পুনর্গঠনের যুগে কোথাও-কোথাও আমলাদের কাজে গাফিলতির জন্য বা অনাচারের জন্য শাস্তি পেতে হচ্ছে—যেমন, সিদ্ধান্ত রূপায়নে বিলম্বের জন্য, অথবা সাংবাদিকদের হয়রানি করার জন্য। কয়েক বৎসর আগে আমলাদের এসব ব্যাপারে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারটা ছিল অচিন্তনীয়। আমলাদের আচরণেও নানা পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। গ্লাসনসতের যুগে দূরদর্শনের কর্মকর্তারা কোনো ব্যক্তি বা গল্প-আলোচনাকে স্বেচ্ছাচারী ভাবে অবাঞ্ছিত আখ্যা দিতে পারেন না, কোনো বিষয়কে নিষিদ্ধ তালিকায় পাঠাতে পারেন না। একটি শহরে ঈশ্বরবিশ্বাসীদের এক গোষ্ঠী নিজেদের সরকারি পঞ্জীভুক্ত করতে চান: তাঁদের ইচ্ছা, শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি পুরনো বাড়ি কিনে সেটিকে তাঁরা উপাসনাস্থল হিসেবে ব্যবহার করবেন। আমলাদের কাছে তাঁরা দরখাস্ত পাঠান। কিন্তু গ্লাসনসতের যুগেও কিছু আমলা প্রাক্-গ্লাসনসত ভাবধারায় আচ্ছন্ন। অতএব ওই দরখাস্ত প্রত্যাখ্যাত হয়, এবং দরখাস্ত-কারীদের উৎপীড়নও করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্লাসনসতের নাগরিকদের জয় হয়। ঈশ্বরবিশ্বাসীরা নিজেদের পঞ্জীভুক্ত করাতে সফল হন। এটাও লক্ষণীয় যে গণতন্ত্রীকরণের যুগে কেবলমাত্র কারখানার পরি-চালকদের জন্যই নয়, পুলিসবাহিনীর মতো সরকারি

ক্ষেত্রেও নির্বাচন শুরু হয়ে গিয়েছে—যেমন, শহরের কোনো এলাকার পুলিশ-প্রধানের পদের জন্য, অথবা একটি জেলার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বিভাগের যে প্রধান, তার পদের জন্য। এভাবে আমলাবর্গের সংস্কারের জন্য ব্যাপক প্রয়াস চলেছে। কিন্তু এই সংগ্রামের অনেকটাই এখনও অসম্পূর্ণ, এবং তাই আগামী দিনেও ওই সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে—এটা উনবিংশ পার্টি কনফারেন্সের অন্যতম সিদ্ধান্তেও জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

পৃথিবীর প্রথম সমাজবাদী রাষ্ট্রের সুপ্ত গণতান্ত্রিক ক্ষমতাকে জাগ্রত, প্রতিষ্ঠিত, উন্নত করার জন্য লেনিনের প্রয়াস ছিল ঐকান্তিক। কিন্তু ব্যক্তিপূজার যুগে, যা পেরেসত্রোইকার আবাহনের আগে অর্ধশতাব্দী অনেক দশক স্থায়ী ছিল—আমলাতান্ত্রিক বাস্তবতা সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে পরাস্ত করে। সোভিয়েতগুলির, অর্থাৎ আইনসভাগুলি ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় কার্যনির্বাহী সংস্থাগুলি। জনপ্রতিনিধিরা আমলাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। উনবিংশ পার্টি কনফারেন্সে তাই সোভিয়েত সমাজের গণতন্ত্রীকরণ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে কার্যনির্বাহী সংস্থার ওপর সোভিয়েতের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে, এবং সরকার, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সোভিয়েতের কার্যাবলী বাড়ানো হবে।

এই পদক্ষেপের মতো আরও কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতে জনসাধারণের কাছে সরকারকে নামমাত্র-ভাবে নয়, প্রকৃতপক্ষেই, দায়বদ্ধ করা যায়। যে পদক্ষেপগুলি উপরোক্তটির চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল : পার্টি-সরকার সম্পর্ক এবং পার্টির সংগঠন ও কার্যাবলী পুনর্বিন্যস্ত করা। পার্টি নিজেকে আদর্শগত, সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কাজে আবদ্ধ রাখবে, আত্মনিয়োগ করবে। কিন্তু অতীতে পার্টি সরকারের নানা কাজ আত্মসাৎ করে, যদিও তার পেছনে কোনো আইনের সমর্থন ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, পার্টি সরকারের বিভিন্ন পদে নিয়োগের ব্যাপার স্থির করত, এবং সরকারি আমলাদের অবশ্য পালনীয় নির্দেশ অনবরত (টেলিফোনে বা অন্যভাবে) পাঠাত। উনবিংশ পার্টি কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে পার্টির হাত থেকে এসব সরকারি কাজ করার ক্ষমতা তুলে নেওয়া হবে।

পার্টির অভ্যন্তরে গণতন্ত্র গড়ার ব্যাপারে লেনিন ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর ঘোষণায় আচরণে এটা ছিল প্রকট। শুধুমাত্র লেনিনের রচনাবলীই নয়, তাঁর আমলে পার্টির রীতিপদ্ধতিসম্বলিত পুস্তক (ম্যানুয়াল), অগণিত সিদ্ধান্ত, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদিতে পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের নীতিমালা, কর্মপদ্ধতি আর আচরণের ব্যাপারগুলি ক্রমাগত ব্যাখ্যা আর পরিশীলিত করা হয়েছিল। এসব অমূল্য নথিপত্র লেনিনের আমলে সর্বদা খোলাখুলি ব্যবহৃত হত। কিন্তু, লিওন ওনিকোভ লিখেছেন, পরবর্তী কালে স্তালিন ওগুলিকে গোপন দলিলে পরিণত করেন, এবং পার্টির লেখ্যাগারে লুকিয়ে রাখেন। এরপর স্তালিন যা করলেন তা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। তিনি মুখে বললেন যে তিনি লেনিনের অনুসারী। কিন্তু বাস্তবে তিনি গোপন নিয়মকানুন দ্বারা যে-পার্টিতে লেনিন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেখানে আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ স্থাপন করলেন। খোলাখুলি আলোচনা, যৌথ নেতৃত্ব, পার্টির নির্বাচিত আমলা এবং পার্টির স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ—লেনিন ছিলেন এসবের ওপর আস্থাশীল। এর বিপরীতে, স্তালিন পছন্দ করতেন গোপন শলাপরামর্শ। এক ব্যক্তির (অর্থাৎ তাঁর নিজের) শাসন, এবং নিয়োগপ্রাপ্ত, সার্বক্ষণিক, বেতনভোগী পার্টির আমলা এবং কর্মী। লেনিনের সময়ে পার্টির আমলাদের সংখ্যা ছিল স্বল্প, এবং সাধারণ পার্টির সদস্যদের পার্টির কাজে যোগ দেওয়ার সুযোগ ছিল প্রচুর। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মস্কোতেই কয়েকটি জেলা পার্টি কমিটিতে একজন আমলা-পিছু ত্রিশজন সাধারণ সদস্য ছিল, যাঁদের ছিল প্রশিক্ষণ।

স্তালিনের সময়ে, পার্টির সাধারণ সদস্যরা পার্টির কাজ থেকে বহিষ্কৃত হলেন, এবং পার্টির আমলারা পার্টির নির্বাচিত সংস্থাগুলির ক্ষমতা অপহরণ করলেন। পেরেসত্রোইকা আর গ্লাসনসতের একটি প্রধান লক্ষ্য হল পার্টির ব্যাপারে লেনিনবাদকে ফিরিয়ে আনা। এজন্য উনবিংশ পার্টি কনফারেন্সের একটি সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, পার্টির প্রশাসনযন্ত্র নির্বাচিত সংস্থাগুলির কাজকর্ম জবরদখল করে নেবে, এবং একজন কমিউনিস্টের ভূমিকা পর্যবসিত হবে পার্টির সভায় উপস্থিত হওয়ায় এবং প্রার্থী-তালিকায় আর খসড়া প্রস্তাবে বিনা বিতর্কে সম্মতি দেওয়ায়—এই অবস্থা আর অনুমোদনযোগ্য নয়।

সোভিয়েত সমাজের গণতন্ত্রীকরণ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার সংক্রান্ত যে সিদ্ধান্ত উনবিংশ পার্টি কনফারেন্সে গৃহীত হয়েছে, তাতে লেনিনপ্রদর্শিত পথে পার্টিকে পুনর্গঠিত করার জন্য নানা পদক্ষেপের কথা বিশদভাবে বিবৃত আছে। যেমন, ওই সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে নতুন সদস্যদের পার্টিতে প্রবেশের ব্যাপারটি খোলাখুলি পার্টির সভায় আলোচনা হওয়া উচিত। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রবেশ-প্রার্থীদের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা (কোটা) স্বৈরাচারী ভাবে বেঁধে দেওয়া চলবে না। পার্টিতে প্রবেশের যোগ্যতা হিসেবে ব্যক্তিগত গুণাবলী যাচাই করতে হবে—প্রার্থীদের নৈতিক চরিত্র, কাজের প্রতি মনোভাব, এবং পেরেসত্রোইকা প্রচলনে তাঁদের ভূমিকা ইত্যাদির ওপর জোর দিতে হবে। সর্বস্তরে পার্টি কমিটির সদস্য এবং সেক্রেটারিদের একাধিক প্রার্থীর মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা এবং গোপন ব্যালট মারফত নির্বাচিত হতে হবে। পার্টির আমলাবর্গের সংখ্যা কমাতে হবে, পার্টির নির্বাচিত সংস্থাগুলির কাছে তাঁরা থাকবেন দায়বদ্ধ, এবং অধস্তন পার্টির সংস্থায় নির্বাচিত ব্যক্তিদের কার্যকাল সীমাবদ্ধ থাকবে পাঁচ বৎসরে, যদিও দু-তিন বৎসর অন্তর নির্বাচিতদের এক-পঞ্চমাংশকে পুনর্নির্বাচিত হতে হবে, এবং অযোগ্য সভ্যদের কার্যকাল মেয়াদ ফুরোবার আগেই শেষ করে দেওয়ার বন্দোবস্ত থাকবে। উপরন্তু, পার্টির কোনো একটি পদে একজন ব্যক্তিকে পর পর দুইবারের বেশি নির্বাচিত করা উচিত নয়। অতীতে যাঁরা দীর্ঘ-দিন পার্টির গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন থাকতেন, তাঁদের অনেকেই মনে করতেন যে তাঁরা কোনো ভুলত্রুটি করতে পারেন না, এবং তাঁদের কোনো বিকল্প ছিল না। এভাবে তাঁদের নৈতিক অবনতি ঘটে, এবং তাঁরা ক্ষমতার অপব্যবহারে প্রবৃত্ত হন। এ ছাড়া, অতীতে পার্টির উচ্চতর সংস্থাগুলি নিম্নতর সংস্থাগুলির ওপর অন্যায়ভাবে তাদের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিত। উনবিংশ পার্টি কনফারেন্স পার্টির নিম্নতর সংস্থাগুলিকে যথাযথ স্বাধীনতা দানের পক্ষে মত দিয়েছে। তা ছাড়া, এই কনফারেন্স সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সমস্ত পার্টি সংগঠন খোলাখুলিভাবে কার্য নির্বাহ করবে, এবং সভার কার্য-বিবরণী এবং সিদ্ধান্ত পুরোপুরি প্রকাশ করবে। ব্যক্তি-পূজার যুগে পার্টিতে সুযোগসন্ধানী আর সময়সেবীদের ভিড় জমেছিল। এই সংস্কারগুলি কার্যে পরিণত হলে এদের সরে যেতে হবে।

যেমন পার্টি সংগঠনের ক্ষেত্রে, তেমনি সরকারি সংস্থাগুলিতে, অর্থাৎ সর্বস্তরের সোভিয়েতগুলিতে এবং সোভিয়েত-সৃষ্ট সংগঠনগুলিতে গণতন্ত্র প্রচলনের জন্য উনবিংশ পার্টি কনফারেন্স একই রকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে: এগুলি হল, সংক্ষেপে, একাধিক প্রার্থীর নির্বাচনে প্রতিযোগিতা, গোপন ব্যালটে ভোট, কার্যকালের সীমিত মেয়াদ ইত্যাদি। উপরন্তু, এই কনফারেন্স শীর্ষস্থানীয় সরকারি সংস্থাগুলির ব্যাপক পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে বার্ষিক অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেবে কংগ্রেস অব পিপলস ডেপুটিজ। প্রশাসন, আইন-প্রণয়ন এবং ব্যাপক পর্যবেক্ষণের জন্য এই কংগ্রেস যে স্থায়ী সংস্থা গঠন করবে, সেটি হল ক্ষুদ্রাকার দুই-সংসদ-বিশিষ্ট সুপ্রীম সোভিয়েত তাছাড়া, সোভিয়েত

ইউনিয়নের মতো বিশাল, বহুজাতিক দেশের চাহিদা সঙ্গতভাবে পুরণের জন্য স্থানীয় স্তরে উদ্যোগ এবং স্বাধীনতা যথাসম্ভব বাড়ানো দরকার। অতএব, উনবিংশ পার্টি কনফারেন্স সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সরকারি কাজ ও ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস এবং বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।

এই নতুন সংস্থা কংগ্রেস অব পিপলস ডেপুটিজ-এর গঠনপ্রণালী বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। এতে কেবলমাত্র চিরাচরিত এলাকাভিত্তিক কেন্দ্র থেকেই প্রতিনিধিরা আসবেন না, তাঁরা আসবেন আরও বহুবিধ নাগরিক সংস্থা থেকে—যেমন, ট্রেড ইউনিয়ন, বিজ্ঞানীদের সমিতি, যুব কমিউনিস্ট লীগ, সমবায় সমিতি, মহিলা বা বয়স্কদের সংস্থা ইত্যাদি থেকে। এই অভিনব পদক্ষেপ সোভিয়েতসমাজের যে বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে সেটি হল : সোভিয়েত জনসাধারণের মধ্যে নানা গোষ্ঠী আছে, এবং তাদের স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বিচিত্র। এই বৈচিত্র্য কোনো শ্রেণীদ্বন্দ্ব সূচিত করে না। কিন্তু এই বৈচিত্র্য থেকে উদ্ভূত বিভেদ-সংঘাতের সামঞ্জস্যবিধান একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অনেক সোভিয়েত তাত্ত্বিক এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন : এঁদের মধ্যে আছেন জর্জি শাখনাজারভ, যিনি "সোশ্যালিস্ট ডেমোক্রেসি : সাম কোয়েশ্চেনস অব থিওরি" গ্রন্থের লেখক। আর তাতিয়ানা জাসলাভস্কায়াও এ বিষয়ে অনেক স্পষ্টোক্তি করেছেন। তিনি লিখেছেন, মানুষের আচরণের মূল শক্তি বা প্রেরণা আসে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ থেকে, যার ভিত্তিতে একজন মানুষ তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য রচনা করে। কিন্তু প্রত্যেক সামাজিক গোষ্ঠীর কিছু নির্দিষ্ট স্বার্থ আছে, সেগুলির সাথে অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থের মিল বা সঙ্গতি নাও থাকতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে জাসলাভস্কায়া লিখেছেন, যাঁরা একটি বাড়িতে বসবাস করতে চলেছেন, তাঁদের স্বার্থ হল যে বাড়িটির নকশা আর নির্মাণ সুষ্ঠু ও সুন্দর হবে। অন্য দিকে, বাড়ি তৈরির কাজে যাঁরা নিয়োজিত, তাঁরা কিন্তু প্রায়ই অনেক কাজ বাকি থাকা সত্ত্বেও বাড়ি-তৈরি সম্পূর্ণ হয়েছে, এটা প্রমাণের চেষ্টা করেন। অতএব, আমরা বলতে পারি যে ভবিষ্যতে কংগ্রেস অব পিপলস ডেপুটিজ গঠিত হয়ে জনস্বার্থের উপরোক্ত বৈচিত্র্য ও সংঘাতকে স্বীকৃতি দিলে তা সোভিয়েত সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনকই হবে। তা ছাড়া, এ ব্যাপারে আরও একটি যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে। উনবিংশ পার্টি কনফারেন্স যে বিভিন্ন নাগরিক সংস্থা থেকে প্রতিনিধিদের কংগ্রেস অব পিপলস ডেপুটিজ-এ আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার একটা কারণবোধহয় এই যে, এঁদের দ্বারা স্থিত স্বার্থের (অর্থাৎ প্রাক্-পেরেসত্রোইকা আমলের) প্রহরী আমলাদের শক্তি হ্রাস করা যাবে।

এই রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সংস্কারগুলি কার্যে পরিণত হতে নিঃসন্দেহে দীর্ঘ সময় নেবে। সোভিয়েত সংবিধানে এবং পার্টির নিয়মাবলীতে অনেক সংশোধন আনতে হবে। লক্ষণীয় যে, উনবিংশ পার্টি কনফারেন্সের পর প্রশংসনীয় দ্রুততার সঙ্গে সুপ্রীম সোভিয়েত সংবিধানে ও নির্বাচনী আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে ফেলেছে : এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ১৯৮৮ সালের ১ ডিসেম্বর, এবং ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে নতুন পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপরন্তু, এটাও উৎসাহজনক যে ইতিপূর্বে অন্তত কয়েকটি শহর আর জেলার পার্টি কমিটি কায়েমি স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে তাদের অনেকগুলি বিভাগ (যেগুলি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সমান্তরাল হয়ে বহু যুগ ধরে গড়ে উঠেছিল) বন্ধ করে দিয়েছে। এভাবে, সরকার আর পার্টির প্রশাসনযন্ত্রে অযথা যে দ্বিত্বকরণ ঘটেছিল, তার অবলুপ্তি ত্বরান্বিত হবে। পার্টি আর সরকারের কাজ পৃথক রাখার ব্যাপারে লেনিনের যে সিদ্ধান্ত ছিল, তার রূপায়ন সহজতর হবে। পার্টি পুনর্গঠনের ব্যাপারে পুরাতন (প্রাক্-গ্লাসনসত) আর নতুন ভাবধারার যে দ্বন্দ্ব, তা উনবিংশ পার্টি কনফারেন্সের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনের সময়ে লক্ষ করা গিয়েছে : কখনও পুরাতনের কখনও নতুনের

জয় হয়েছে। কোনো-কোনো এলাকায় প্রার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে, এবং যে প্রার্থী অধিকতর ভোট পেয়েছেন, তিনিই প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। আবার এমন এলাকাও ছিল যেখানে পার্টির প্রাচীনপন্থী নেতারা কোনো প্রতিযোগিতাই হতে দেন নি, অথবা, প্রতিযোগিতার অনুমতি দিলেও, তাঁদের পছন্দমতো প্রার্থী যদি প্রতিযোগীর চাইতে কম ভোটও পান, তাঁকেই প্রতিনিধি হিসেবে কনফারেন্সে পাঠানো হয়েছে। যদি এই ধরনের ঘটনায় পেরেসত্রোইকা আর গ্লাসনসতের প্রবক্তারা বিচলিত বোধ করেন, তাহলে তাঁরা যেন শাখনাজারভের উক্তি স্মরণ করেন। শাখনাজারভ বলেছেন, বুর্জোয়া গণতন্ত্র নিজেকে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করতে সুদীর্ঘ সময় নিয়েছে; অতএব, আমরা আশা করতে পারি না যে জন্মের অব্যবহিত পরেই সমাজবাদী গণতন্ত্র নিখুঁত অবস্থায় উপনীত হবে।

পেরেসত্রোইকা নতুন কাজের ধারা প্রবর্তন করেছে। যে-কোনো নতুন পদক্ষেপের মতো এটিও স্বল্পকালের জন্য কিছু-কিছু পরোক্ষ অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। তা ছাড়া, ব্যক্তিগত উদ্যম এবং যৌথ প্রচেষ্টায় অনিবার্য পার্থক্যের ফলে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো বৈচিত্র্যময় দেশের নানা অংশে বিভিন্ন সময়ে পেরেসত্রোইকার প্রগতি অসম হতে বাধ্য। মাঝে-মাঝে জনগণ পেরেসত্রোইকার অগ্রগতি আশানুরূপ হচ্ছে না, এই অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারেন। এটা কিন্তু প্রত্যাশিত, এবং এটা গ্লাসনসতের জয়ই সূচিত করে। ব্যক্তিপূজার যুগসমূহে যে নৈতিক অসাড়তা সমগ্র দেশকে প্রায় গ্রাস করেছিল, গ্লাসনসত যে তাকে বিদূরিত করছে, এই অসন্তোষ তারই একটি অভিব্যক্তি।

তিন

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পুনর্নবীকরণের তৃতীয় অর্থাৎ সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিকটি বুঝতে গেলে প্রাক-পুনর্নবীকরণ যুগসমূহের নৈতিক দেউলেপনার ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। এই ব্যাপারটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে যেসব চলচ্চিত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তার একটির নাম "দ্য কোল্ড সামার অব নাইনটিন ফিফটিথ্রী"। ১৯৫৩ সালে, স্তালিনের মৃত্যুর পরেই, অপরাধীদের গণমুক্তি ঘোষণা করা হয়। কেন এই ঘোষণা করা হয়েছিল, তার কারণ কোথাও প্রকাশ করা হয় নি, কিন্তু এর উদ্দেশ্য যে মহৎ ছিল না, সেটা বুঝতে অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। বহু বিপজ্জনক অপরাধীকে ওই সময়ে কারামুক্ত করা হয়; তাদের মধ্যে ছয় বন্ধুর একটি দল (ওই চলচ্চিত্র অনুযায়ী) সোভিয়েত দেশের উত্তরাঞ্চলে একটি দূরবর্তী গ্রামে হানা দেয়। মাত্র ছয় জন লোক পুরো একটি গ্রামের সমস্ত অধিবাসীকে পর্যুদস্ত করে। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব হল? চলচ্চিত্রে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, ব্যক্তির স্বাধীনতা আর সম্মান যে সমাজে নিশ্চিহ্ন, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে পারস্পরিক অবিশ্বাস, ভয় আর সন্দেহে যে সমাজ বিদীর্ণ, একটি মানুষকে যেখানে অপর একজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করে সরকারি চর হিসেবে বেঁচে থাকতে হয়, সরকারের আতঙ্কে যেখানে সমগ্র সমাজ রুদ্ধশ্বাস, সেখানে কয়েকজন বদমায়েশের বিরুদ্ধেরুখে দাঁড়ানোও সম্ভব নয়। ফলে, ওই গ্রামে ছয় জন গুণ্ডা শাসনকর্তা হিসেবে বাস করতে থাকল। কিছুদিন পর ওই গ্রামে দুই রাজনৈতিক বন্দী বসবাস করতে আসেন। অতীতে ওঁরা বন্দীশিবিরে অনেক অত্যাচার সহ্য করেছিলেন; এখন ওঁরা ওই গ্রামে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে এলেন। সরকারের চোখে এই দুই জনগণশত্রু। কিন্তু ওই দুই জনই তাঁদের চরিত্রমাহাত্ম্য, বিবেকবল, ও শক্তিমত্তায় গোটা গ্রামটিকে পরিত্রাণ করে, এবং ছয়টি শয়তানকে পরাভূত করে।

এই ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং প্রদর্শন থেকে প্রমাণ হয় যে পেরেসত্রোইকা ও গ্লাসনসতের একটি

মৌলিক উদ্দেশ্য হল মানুষের আত্মসম্মানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ওই চলচ্চিত্রেই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক বন্দীদের চরিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, পেরেসত্রোইকা আর গ্লাসনস্তের আবির্ভাবের পূর্বে প্রধানত কবি, উপন্যাসিক, চলচ্চিত্রনির্মাতা আর থিয়েটারশিল্পীরাই সমাজের নৈতিক পক্ষাঘাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিলেন, এবং মানুষের মনে সত্য এবং আত্মসম্মানের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা অনেক সময়েই ব্যর্থ হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রাক্-গ্লাসনসত যুগে "দি অ্যাপয়েনমেনট" নামের একটি চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ ছিল। এর প্রধান চরিত্র একজন মেধাবী ব্যবস্থাপক, যিনি তাঁর উপরওয়ালা অকর্মণ্য হওয়া সত্ত্বেও একটি উদ্যোগ পরিচালনায় সফল হয়েছিলেন। তাঁর সাফল্যে মূল কারণ ছিল, তিনি উদ্যোগ পরিচালনায় মানবিক দিকের বা ব্যক্তিমর্যাদার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। অতএব, চলচ্চিত্রটি নিষিদ্ধ হওয়াই ছিল প্রত্যাশিত। কারণ এটি যে যুগে—অর্থাৎ ব্যক্তি-পূজার যুগে—নির্মিত হয়েছিল, তখন উচ্চপদস্থ আমলারা মানুষের মর্যাদারক্ষার ব্যাপারে মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করতেন না। এই নিষিদ্ধকরণ নিয়ে আলেকজান্দার ভোলোভিন মন্তব্য করেছেন যে এ ছিল এমন এক সময় যা সমগ্র মানবজাতির নৈতিক-আত্মিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংস্পর্শহীন—যে আদিম যুগে মানুষ ছিল গুহানিবাসী তখনও বোধহয় এর চাইতে খারাপ অবস্থা ছিল না।

১৯২২ সালে লেনিন লিখেছিলেন, রাজনীতিতে বিবিধ কাজকর্মের মধ্যে অসূয়াজনিত ক্রিয়াকলাপই নিকৃষ্ট। স্তালিন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লেনিন মন্তব্য করেছিলেন, অসূয়া স্তালিনের চরিত্রের একটি খারাপ দিক। যদি অসূয়ার সঙ্গে অবাধ ক্ষমতার অন্বেষণ জুড়ে দেওয়া যায়, তাহলে স্তালিন আর তাঁর অনুচরদের অন্যায়, অমানবিক ব্যবহারের অন্তত একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে। এই ব্যবহার সমস্ত সাংস্কৃতিক জগৎকে কলুষিত করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যাঁরা ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধান করতেন, তাঁদেরও চরম উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল। অধ্যাপক আগদাস বুরগানভ লিখেছেন, লেনিনের রচনাবলী বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করে জনৈক ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্তে আসেন যে অকটোবরের পর নানা গোষ্ঠী বহুস্তরবিশিষ্ট সোভিয়েত অর্থনীতি গড়ে তোলায় নিয়োজিত ছিল, এবং সরকারি নীতিকে এই গোষ্ঠীসমূহের প্রচেষ্টার মধ্যে সামঞ্জস্য আর ভারসাম্য বজায় রাখতে হত। স্তালিনের মতে, একমাত্র দরিদ্রতম কৃষকই ছিল শ্রমিকের মিত্র—এই মতের দ্বারাই ১৯৩০-এর দশকে মধ্যম স্তরের কৃষকদের ওপর দমননীতি সমর্থন করা হয়েছিল। এই ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত ছিল স্তালিনের মতের বিরোধী। অতএব, যে নিবন্ধে ওই সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ ছিল, সেই নিবন্ধ প্রত্যাহার করতে হল, নতুবা ওই ঐতিহাসিক চাকরিচ্যুত হতেন। অপর একজন ঐতিহাসিককে শাস্তি পেতে হয়েছিল, কারণ তিনি প্রমাণ করেছিলেন, লেনিন-লিখিত "দ্য প্রোলেটারিয়ান রেভোলিউশন অ্যান্ড দ্য রেনিগেড কাউটস্কি" থেকে স্তালিন এমনভাবে ভুল উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, যাতে স্তালিনের যে অভিমত—অর্থাৎ অকটোবর বিপ্লবের পেছনে শ্রমিকরাই ছিল একমাত্র শক্তি—সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভবিষ্যতে অগণিত নিরীহ কৃষককে নির্বিচারে হত্যার জন্য এই অভিমত প্রতিষ্ঠা করা জরুরি ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক বুরগানভ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, লেনিনের মতে (সব না হলেও) প্রায় সব স্তরের কৃষকরাই অকটোবর সমাজবাদী বিপ্লবে যোগদান করেছিল। উপরন্তু, ১৯২৯ সালে যখন বলপূর্বক যৌথ কৃষি প্রচলনের নৃশংসনীতি গৃহীত হয়, তখন মধ্যম স্তরের কৃষকই ছিল দেশের কৃষিতে মুখ্য চরিত্র, এবং ওই কৃষক ছিল যুগপৎ মালিক আর কর্মী। অকটোবর বিপ্লবের পর থেকে কৃষককুলের শ্রেণীচরিত্রে যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এসেছিল, স্তালিন সেটিকে গুরুত্ব দেন নি। এ ছাড়া,

যেটা আনাতোলি বুটেঙ্কোর মতো লেখক জোর দিয়ে বলেছেন, বলপূর্বক যৌথ কৃষি প্রবর্তনের আর-একটি যে অজুহাত দেখানো হয়, অর্থাৎ যুদ্ধের ভয়, ১৯২০-র দশকের শেষে তার অস্তিত্বই ছিল না।

কিন্তু যুক্তি-তথ্য দিয়ে স্তালিনের মতসংশোধন করা বা তাঁর সমালোচনা করা ছিল অভাবনীয়। সমস্যাটা এই রকম ছিল, লিখেছেন বোরিস বোলোতিন, যে স্তালিনের কাছে এটাই ছিল অবাস্তব যে তাঁর অভিমতের কোনো সমালোচনা হতে পারে। এসব ব্যাপারে তাত্ত্বিক গবেষণা করার একচ্ছত্র অধিকারও একমাত্র তাঁরই, এটাই ছিল স্তালিনের দাবি এবং বিশ্বাস। দেশে এমন এক মতিচ্ছন্নতার পরিমণ্ডল সৃষ্ট হল, যেখানে সব সিদ্ধান্তই সর্বসম্মত, কারণ এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত না, যাতে স্তালিনের সম্মতি নেই। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিওনিদ আইওনিন বলেছেন, মানুষ বিরুদ্ধ মত বা ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ তো বন্ধ করলই, এমনকী কোনো প্রতিবাদী মতামত যে মনে-মনে পোষণ করা অনুচিত বা বিপজ্জনক, এই অবস্থাও অনেকে মেনে নিল। সমাজবাদের এই আমলাতান্ত্রিক বিকৃতিকে পুনর্নবীকরণের সমর্থকেরা সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন। যে মতৈক্যের ভিত্তি চিন্তার দৈন্য আর কর্তাভজা রীতি, তাকেও এঁরা বাতিল করেছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বা অন্যত্র যাঁরা এখনও ব্যক্তিপূজার যুগের মায়া থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেন নি, তাঁরা সমাজের পুনর্নবীকরণের প্রবক্তাদের কাজ বা ভাবনার কিছু-কিছু অপব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। এই অপব্যাখ্যাগুলি অপসারণ করার জন্য দুটি ব্যাপার স্পষ্ট করা প্রয়োজন। প্রথমত, যদিও স্তালিন আমলে লক্ষ-লক্ষ ব্যক্তির ওপর নৃশংস পীড়ন ও হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এবং ওই ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে দক্ষতম দলীয় ও সরকারি কর্মী (এমনকী সৈন্যবাহিনীর নেতারাও) ছিলেন, তথাপি সাধারণ মানুষ স্তালিনবাদ এবং সমাজবাদের অভিন্নতা মেনে নেন নি। যেসব প্রাজ্ঞ-প্রবীণ বলশেভিকদের অন্যায়ভাবে কয়েদি শিবিরে পাঠানো হয়েছিল এবং অপমান করা হয়েছিল, তাঁরাও সমাজবাদের আদর্শ এবং বিচ্যুতিকে এক করে দেখেন নি। এঁদেরই একজন, নাম কুপ্তসভ, লিখেছেন যে ওইসব অমানবোচিত অনাচারের মূলে ছিল কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির মারাত্মক ভুল। অতএব, বর্তমান সময়ে স্তালিনবাদের ভক্তরা যদি মনে করেন যে সমাজবাদের পুনর্নবীকরণের সমর্থকেরা স্তালিনবাদের নিন্দা করতে গিয়ে সমাজবাদকেই হেয় করছেন, তাহলে সেটা হবে অন্যায় বিচার।

দ্বিতীয়ত, স্তালিনের অন্ধ পূজারীরা একটি প্রশ্ন তুলে থাকেন: সেটি হল, স্তালিনের আমলের রাজনৈতিক উৎপীড়নের চাইতে ওই আমলের অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল্য বেশি কি-না। এই প্রশ্নটি কিন্তু অবান্তর। দিমিত্রি ভোলকোগোনভ লিখেছেন, এই প্রশ্নটি নীতিবিরুদ্ধ, কারণ এমন কোনো ভালো কাজ নেই, যা দিয়ে বর্বরতাকে সমর্থন করা যায়। প্রসঙ্গত, হিটলারের শাসনকালে জার্মানিতে যে অভাবনীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছিল, তার জন্য ইহুদিদের বিরুদ্ধে হিটলারের জঘন্য অপরাধ মার্জনা করা যায় না। উপরন্তু, এই প্রবন্ধের প্রথম অংশের আলোচনা অনুসারে পুনর্বার বলা উচিত যে, স্তালিনের আমলে রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং তাত্ত্বিক ভ্রান্তি / গোঁড়ামি না থাকলে, যে অর্থনৈতিক প্রগতি বাস্তবে অর্জিত হয়েছিল, তার চাইতে অতুলনীয় রকম বেশি অগ্রগতি সাধ্যায়ত্ত ছিল।

"অকটোবর অ্যান্ড পেরেসত্রোইকা: দি রেভোলিউশন কনটিনিউজ"—এই পুস্তিকায় গোরবাচেভ লিখেছেন, কখনও-কখনও বলা হয় যে স্তালিন তাঁর আমলের অনাচার-অবিচারের খবর রাখতেন না, কিন্তু যেসব দলিলপত্র প্রাপ্তিসাধ্য, তা থেকে বোঝা যায় যে স্তালিন সম্পর্কে ওই বক্তব্য সত্য নয়। গোরবাচেভ আরও লিখেছেন, ব্যাপক দমন, পীড়ন এবং অনাচারের জন্য দল ও জনগণের কাছে স্তালিন আর তাঁর ঘনিষ্ঠ

সহকর্মীরা যে দোষে অভিযুক্ত সেই দোষ বিকট ও অমার্জনীয়, এবং সেটি সব প্রজন্মের নিকট শিক্ষাপ্রদ।

চার

এই প্রবন্ধের শেষাংশে, সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবর্তিত পেরেসত্রোইকা থেকে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলি (যেমন, ভারত, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যানড) কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সে সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলা যেতে পারে। বর্তমান লেখকের ও অন্যান্য অনেকের গবেষণা এবং জনসাধারণের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা এটাই প্রমাণ করে যে, এই দেশগুলিতে, কৃষি বা শিল্পের ক্ষেত্রে, ব্যতিক্রম বাদ দিলে, রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ কতিপয় সুপরিচিত ব্যাধিতে আক্রান্ত: সেগুলি হল সম্পদের অপচয়, অকর্মণ্যতা, আর ভ্রষ্টাচার। শুধু প্রাত্যহিক কাজের ব্যাপারেই নয়, মূল পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও এই ব্যাধিগুলি প্রকট। এই গলদগুলি যে দূর করা যাচ্ছে না, তার প্রধান কারণ হল, ভালোকাজের জন্য উৎসাহ বা পুরস্কার প্রদান, আর মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার বা শাস্তির বিধান—এসবের প্রায় কোনো ব্যবস্থাই রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিতে নেই। কাজ এবং বেতন, কর্মদক্ষতা এবং পদোন্নতি—এদের মধ্যে কোনো ন্যায়সঙ্গত সম্পর্ক হয় অনুপস্থিত, নতুবা নগণ্য। অবশ্য, কিছু ব্যতিক্রমী সরকারি সংস্থা আছে, এবং প্রতিটি সংস্থায় আছেন কিছু অসাধারণ ব্যক্তি, যাঁরা শুধুমাত্র বিবেকের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজ করেন, যাঁদের জন্যই দেশে অর্থনৈতিক প্রগতি মন্থর হলেও স্তব্ধ হয়ে যায় নি, এবং যাঁরা অগ্রগতির আশাকে সদাজাগ্রত রেখেছেন। এঁদের ছেড়ে অন্যত্র দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, বহু সরকারি সংস্থায় একটি অভিনব নীতি আত্মপ্রকাশ করেছে: যে কত কম কাজ করে, তার রোজগার তত বেড়ে যায়। অর্থাৎ, প্রশাসনে স্বাভাবিকতার বিভ্রম জননানসে জীইয়ে রাখার জন্য সাধারণ সময়সীমায় (ধরা যাক সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে) যে কাজ হওয়া উচিত কিন্তু হচ্ছে না, তার অন্তত অল্প একটি অংশ অতিরিক্ত সময়ে অনেক বাড়তি হারে মজুরি দিয়ে করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অতএব, দেখা যায়, অনেক সরকারি সংস্থাতেই বিরাট সংখ্যায় উদ্বৃত্ত কর্মী থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত সময়ে কাজের জন্য মজুরি বা বেতনের খরচা (ওভারটাইম বিল) ক্রমবর্ধমান।

একটি অনুন্নত দেশে বিপুলপরিমাণ ব্যয়ে নির্মিত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যথাযথ পরিচালনব্যবস্থা না থাকলে সাধারণ লোকের চরম ক্ষতি। দেশের অগ্রগতি এসব প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু যেসব উচ্চপদস্থ আমলাদের ওপর এই প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনভার ন্যস্ত, তাঁরা কিন্তু নিজেদের এসব প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন না। একটি সরকারি শিল্পে যদি তিন বৎসরের মধ্যেই (এরকম উদাহরণ ভারতে আছে) এত ক্ষতি হয়, যার পরিমাণ ওই শিল্পের মূলধনী ব্যয়ের চাইতেও বেশি, তাতে শীর্ষস্থানীয় আমলারা একেবারেই বিচলিত হন না। কারণ, ওই ক্ষতি সত্ত্বেও তাঁরা যে অন্যায় সুবিধাগুলি ভোগ করছেন (যেমন নিখরচায় বা নামমাত্র খরচায় বাড়ি আর চালকসমেত গাড়ির ব্যবহার), সেগুলি প্রত্যাহৃত হয় না।

যদি দক্ষিণ আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলির শাসকগোষ্ঠী জীবনধারণের মানের দ্রুত উন্নয়নে আগ্রহী হন, তাহলে তাঁদের উচিত বিভিন্ন ক্ষেত্রের সরকারি সংস্থায় পেরেসত্রোইকা আর খোজরাশ্চট প্রবর্তন করা। আর্থিক স্বয়ম্ভরতার নীতি গৃহীত হলে একটি সরকারি সংস্থার প্রতিটি কর্মীকে তাঁর নিজের কাজের জন্য নির্দিষ্টভাবে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। পরগাছাবৃত্তি লোপ পাবে। বর্তমানে এই অনুন্নত দেশগুলির সরকারি সংস্থাসমূহে একজন কর্মকর্তা বা কর্মীর সামনে দুটি বিকল্প আছে; দক্ষতা,

নিষ্ঠা আর পরিশ্রম সহকারে কাজ করা, অথবা আলস্যেমিতে ডুবে থাকা। দ্বিতীয় বিকল্পটিই সাধারণত পছন্দ করা হয়। খোজরাশ্চট প্রবর্তিত হলে দ্বিতীয় বিকল্পটি লুপ্ত হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে পার্টি আর সরকারি আমলাবর্গের কোনো-কোনো অংশ পুনর্গঠনের বিরোধিতা করেছে। ভারত, বাংলাদেশ বা থাইল্যানডের মতো দেশে অবশ্য তুলনামূলকভাবে পার্টির (অর্থাৎ শাসক দলের) আমলাবর্গের প্রভাব প্রায় গুরুত্বহীন, যদিও সরকারি আমলাবর্গের কিছু অংশ যে খোজরাশ্চটের প্রবর্তনে বাধা দেবে, এটা ধরে নেওয়া যায়। অনতিদূর ভবিষ্যতে রাজনৈতিক নেতারা আমলাদের সৃষ্ট এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারবেন—এটাই সাধারণ লোকের প্রত্যাশা। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই মুহূর্তে, এই দেশগুলিতে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে পেরেসত্রোইকা আর খোজরাশ্চট প্রবর্তনের বিশেষ আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে না।

মানবজন্ম

রত্নেশ্বর হাজরা

মানুষ জন্মায়—মানুষের
জন্ম হয় রোজ
মানুষের এই যে জন্মানো—এটা
একটা ঘটনা।
এই ঘটনার চিহ্ন সর্বাঙ্গে অমর হয়ে থাকে
মানুষেরা মানুষের পদবাচ্য হয়।
ফলত দুঃখকে দুঃখ বলে মানুষেরা
বস্তুকে বস্তুর নাম দেয়—।
এই ঘটনার জন্ম মরুভূমিগুলো মরুভূমি
সবুজেরা সবুজের নামে অভিহিত
হয়ে উঠতে থাকে—
বেত্রবতী নদী আর অশ্বত্থের ডালপালা প্রকৃতির বিবর্তনগুলো
সম্মানিত হয়—।
মানুষ জন্মায়—মানুষের
এই যে জন্মানো—এটা একটা ঘটনা।
এই ঘটনার
বিচিত্র অসংখ্য দাগ রঙিন জড়ুল হয়ে প্রত্যেকের গায়ে
লেগে থাকে
সৌভাগ্যরেখার মতো কখনো বা
কলঙ্করেখার মতো করতল জুড়ে
আজীবন বেঁচেবর্তে থাকে.....
মানুষের
জন্মানোই তার কাছে সবচেয়ে বিশিষ্ট ঘটনা—

ফল্গু

সুকুমার চৌধুরী

ঝরে যাবো, যেন নির্ভার শিশির।
এরকম সাবলীল, বীতশব্দ, বিভা।
গন্ধহীন, বর্ণহীন খুলে যাবো
নিবিড় ঘাসের বুকে স্বতোৎসার

যদি ধুয়ে যায় বোধি
যদি অনুভবে বেজে ওঠে এইসব
ঝরে-যাওয়া হিম
ভোররাতে কোজাগর চাঁদের কিরণ
যদি ভালোবাসে দ্যুতি,

শান্ত আমি প্লুত
নির্বাণের দিকে হেঁটে যাবো, আর
হাঁটাপথে বেজে উঠবে অজস্র নির্মাণ

প্রেমে অপ্রেমে

সোফিওর রহমান

আমার বরাত ভালো কবিতা এই শরীর ছুঁয়েছে
শরীর সময়ের চোখে কচিপাতা, নতুন শহর
হাড় ও মাংসে নববন্দর
যেমন শব্দে-শব্দে কবিতার ঘর—
ওই ঘরে বাস করে এ শরীর সংগীত শিখেছে, হৃদয়ে মন্দাকিনী ;
সে এখন শিহরনে বহুধা, মোহরপ্রাসাদ ;
এ প্রাসাদে গন্ধের ফুল ধরে ঘামে ও ঘুমে
ফুলের সে মধু সঞ্চিত রাখে বুকের ওম—
আমার বরাত ভালো কবিতা এই শরীর ছুঁয়েছে।
এ জীবন তাই কবিতার অতীন্দ্রিয় ঠিকানায় কেঁদে ওঠে, এবং
জাগতিক ঘেরাটোপে দায়বদ্ধ
কখনওবা সংগ্রামপাথরে রক্তাক্ত নিমগন্ধের মুখোমুখি
তবু কপালে কবিতার টিপ, আমি কি মাতাল হই ?
পতনকে নদীর বাঁক ভাবি, দুঃখকে প্রেম
আর যন্ত্রণাকে বিজ্ঞান-জ্ঞানে চলে যাই নবতমবন্দরে
তখনি এ-দেহে নোঙর করে কবিতা
আমার বরাত ভালো কবিতা এই শরীর ছুঁয়েছে।

পৃথিবী পবিত্র হয়ে উঠছে

নীহারকান্তি ঘোষদস্তিদার

প্রাগৈতিহাসিক কোনো গহ্বর থেকে যেন
জ্যোৎস্নার স্রোত গড়িয়ে পড়ছে
ইরানী রানীর হাতে মুদ্রায় ধরে রাখা
মদের অজস্র পাত্র থেকে উপছে পড়া
অফুরন্ত ঢলের মতো।
আরণ্যক কোনো অনাবৃতা রমণীর
পাতলা চামড়ার মতো লোভনীয় জ্যোৎস্না।
সমুদ্রের মতো ভাসমান হাওয়ায়-হাওয়ায়
জ্যোৎস্নার তরল স্রোত ছড়িয়ে পড়ছে
মধ্যরাত্রির দিক থেকে দিগন্তের
বিশালতায়।
ধ্যানস্থ বুদ্ধের মতো প্রকৃতি
সেই বিশালতার মধ্যে
স্থির নির্বাক।
আধিদৈবিক কোনো অন্তশ্চেতনায়
রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে
শাখা-প্রশাখায় অভিব্যক্তির
আন্দোলিত হিল্লোল।
হিল্লোলিত হয়ে উঠছে বাতাস
পরিশুদ্ধ নৈঃশব্দ্যের আনন্দে।
বহুদূর শতাব্দীর নক্ষত্রের রহস্যের মতো
হয়ে উঠছে রাত্রি
সেই আনন্দে।
আনন্দের সঙ্গমে রাত্রির ধরিত্রী
জ্যোৎস্নাকে কোমল শিশুর মতো
ভালোবাসছে
পরিপূর্ণ নারীর যৌবনের
ঘনিষ্ঠ তীব্রতায়।
রাত্রিটা যৌবন হয়ে যাচ্ছে নিবিড়তায়।
প্রাগৈতিহাসিক এক আশ্চর্য নিবিড়তায়।
পৃথিবী সেই রহস্যময় নিবিড়তার
অবিনশ্বর অংশীদার হয়ে উঠছে জ্যোৎস্নার মধ্যে।
পৃথিবী পবিত্র হয়ে উঠছে।

ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক-আন্দোলন, ১৮২৪-১৯২০

বিনয় চৌধুরী

১০.১

বীরসা আন্দোলনের পটভূমিকা হিসেবে মুণ্ডা আন্দোলনের (১৮৫৭-১৮৯৫) উপর চারটি বিশিষ্ট প্রভাবের রূপ আমরা বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি: স্বাধীন মুণ্ডারাজের ধারণার উন্মেষ এবং বিকাশ; ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে অপস্রিয়মাণ বিশ্বাস; খ্রীষ্টান মুণ্ডাদের মধ্য থেকে এক নূতন নেতৃত্বের আবির্ভাব, এবং সমসাময়িক সাঁওতাল খেরওয়ার আন্দোলনের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব।

আগেই উল্লেখ করেছি, বীরসার ব্যক্তিগত সম্মোহনী প্রতিভা ছাড়া এসব উপকরণ থেকে সুসংহত এক বিশাল আন্দোলন গড়ে উঠতে পারত না। তার ধ্যানধারণায় এসব বিভিন্ন প্রভাবের আদিরূপও অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। মুণ্ডারাজের স্বপ্ন বীরসারও সব উদ্যোগের মর্মমূলে। কিন্তু আগের মুণ্ডা নেতারা ব্রিটিশ রাজের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নি; তারা বলত, জমি বাবদ রাজস্ব তারা ব্রিটিশ-রাজকেই দেবে। বীরসার কাছে ব্রিটিশরাজ 'কলুষময়' পৃথিবীর অংশবিশেষ; তার সম্পূর্ণ বিলোপ না ঘটলে মুণ্ডারাজের স্বপ্ন অলীক ভ্রান্তি মাত্র। চাইবাসার জার্মান মিশন স্কুলে[২৫৩] বীরসার ছাত্রজীবন কেটেছে; কিন্তু আস্তে-আস্তে এ মিশনের সঙ্গে সব সংস্রব ছিন্ন হয়ে যায়। অন্যান্য অনেক মুণ্ডার মতো বীরসাও তিক্ত-বিরক্ত হয়ে এ মিশন ছেড়ে রোমান-ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে যুক্ত হয়। সে যোগও ক্ষণস্থায়ী। খ্রীষ্টান-বিশ্বাস ছেড়ে সে ফিরে যায় তার আদি ধর্মবিশ্বাসে। নিজের পরিচয় দিত "মুণ্ডারী কোল" বলে।[২৫৪] বীরসার চিন্তায় খেরওয়ার 'ধর্ম-সংস্কার' আন্দোলনের প্রভাব অনস্বীকার্য, কিন্তু তার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দর্শনের বনিয়াদ ব্যাপকতর। এ আলোচনা আমরা পরে করছি।

বীরসা আন্দোলনের দুটি পর্যায়: জুলাই-অগস্ট ১৮৯৫ এবং ডিসেম্বর ১৮৯৯-জানুয়ারি ১৯০০। এ দুই পর্যায়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। তাই আমরা স্বতন্ত্রভাবে তাদের আলোচনা করব।

তবে পূর্ববর্তী আন্দোলন থেকে এ দুই পর্যায়ের আন্দোলনই বিশিষ্ট। বিদ্রোহী মুণ্ডাদের ধর্ম এবং রাজনীতির মধ্যে যে নিগূঢ় যোগ বীরসা আন্দোলনে দেখি, তা আগে প্রায় ছিল না বললেই চলে।

১০.২

বীরসা আন্দোলনের শুরু এক ধর্মীয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে।[২৫৫] মুণ্ডাদের সে বলে, সে ভগবানের প্রেরিত দূত; বিপুল এক প্রলয়ের পর এ কলুষময় পৃথিবীর আসন্ন বিনাশ ঘোষণার জন্যই তার আবির্ভাব; এ প্রলয়ে সরকারও নিশ্চিহ্ন হবে ('ভেসে যাবে'); নিষ্ফল হয়ে যাবে বর্তমানের সব জীবিকা, এমনকী কৃষিকাজও। তার এক ঘোষণা থেকে মনে হয়—তার ধারণা ছিল, মুদ্রাসর্বস্ব অর্থনীতির সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটবে: 'এ দুনিয়ার সব টাকাপয়সা জল হয়ে যাবে; তাদের হাতে যা কিছু অর্থ আছে, তা যেন অতি শীঘ্র তারা খরচ করে ফেলে, এবং তা দিয়ে বস্ত্রাদি কেনে।' একমাত্র তার অনুগামীদের জন্যই ছিল তার অভয়বাণী। সাম্রাজিক এ বিপর্যয় তাদের স্পর্শ করবে না; তারা সবাই জড়ো হবে বর্তমান জনপদ থেকে দূরে এক 'উঁচু ডাঙ্গায়'; একটিমাত্র নিরাপদ জায়গা হবে সেটি; অনুগামীদের নিয়ে বীরসা সেখানে নিষ্কলুষ এক পৃথিবী গড়ে তুলবে।

লোহারডাগার পুলিশাধ্যক্ষ জানতে পারে[২৫৬] গ্রাম থেকে প্রায় ষাট গজ দূরে এ নূতন জায়গা; শ দেড়েক বা দু শ অনুগামী সেখানে জড়ো হয়েছে; 'বহুসংখ্যক' চালাঘর তাদের জন্য সেখানে বানানো হয়েছে। 'দেওয়ান' হিসেবে নিযুক্ত এক তাঁতি অন্য তিন-চারজন 'পদাধিকারী'র সঙ্গে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে এ জায়গায় আসার জন্য সবাইকে বলছে।

জনপদ থেকে দূরে অনুগামীদের এ নূতন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে বীরসার সম্ভবত এ ধারণা ছিল যে বর্তমানের পঙ্কিল সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সংস্কার সম্ভব নয়; নূতন ব্যবস্থার আবির্ভাব হবে বর্তমান ব্যবস্থার বিনাশের পর। কিন্তু বীরসার পরিষ্কার ধারণা ছিল, ব্রিটিশরাজ থেকে এভাবে দূরে সরে যাওয়া সম্ভব নয়; নূতন পৃথিবীতে উত্তরণের পথে তার সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য, এবং তাতে সফল হলেই নূতন আদর্শ মুণ্ডা-রাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সে সংঘর্ষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পর্কে কোনো সংহত পরিকল্পনা তখন বীরসার ছিল বলে মনে হয় না। তবে এটা বোঝা যায়, সহিংস পন্থার অপরিহার্যতা সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না।

আসলে মুণ্ডা-আন্দোলনে বীরসা আগে থেকেই সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল। অরণ্যসম্পদের উপর মুণ্ডা-দের দীর্ঘদিনের অধিকার সংকোচনের জন্য নূতন সরকারি বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে ১৮৯৪ সালে এক বড়ো আন্দোলন সে গড়ে তোলে।[২৫৭] ১৮৯৫ সালের আন্দোলনের শুরু থেকেই তার নানা ঘোষণা এবং কাজে ব্রিটিশরাজবিরোধিতা সুস্পষ্ট। প্রলয়ের কালে 'সরকার ভেসে যাবে'—এ ঘোষণার সময় ব্রিটিশরাজ উচ্ছেদের কথাই সম্ভবত তার মাথায় ছিল। তার নূতন 'দেওয়ান' এবং অন্যান্য প্রতিনিধিদের গ্রামে-গ্রামে এ ঘোষণা করার ভার দেওয়া হয়েছিল যে মুণ্ডারা যেন তাদের কুড়ুল আর ফরসা নিয়ে ২৭শে অগস্ট ওই নূতন জায়গায় আসে। সম্ভবত ব্রিটিশরাজ উচ্ছেদের সশস্ত্র প্রতিরোধের ধারণার সঙ্গে এ নির্দেশ যুক্ত। মুণ্ডাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল—তার অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবে ব্রিটিশবাহিনীর বুলেট নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে, জলে পরিণত হবে।[২৫৮] এ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা লোকের মুখে-মুখে এত ছড়িয়ে পড়ে যে, লোহারডাগার পুলিশাধ্যক্ষ ঠিক করে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইত্যাদি দমানোর জন্য সরকারি নির্দেশ-মতো খালি কার্তুজ ব্যবহার করা নির্বুদ্ধিতা হবে; কারণ বিদ্রোহীরা একে বীরসার কথার যথার্থতার প্রমাণ ধরে নিয়ে আরো 'দুঃসাহসী' হবে।[২৫৯] বীরসা ধরেই নিয়েছিল, সরকার তাকে রেহাই দেবে না। শিষ্যদের

তাই সে বলত, সরকার তিনদিনের বেশি তাকে হাজতে পুরে রাখতে পারবে না ; কয়েদখানায় তার স্থূল দেহ এক কাষ্ঠখণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে সেখানে পড়ে থাকবে; তার বিদেহী আত্মা অন্যত্র চলে যাবে। থানার হেড-কনস্টেবল তার দলের কার্যকলাপ দেখার জন্য গেলে 'তার অনুগামীরা তাকে গ্রাম থেকে বার করে দেয়, তার বিছানাপত্র, বাসনাদি নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়; বীরসা বলে, 'সাহেব লোকদের' রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে ; আর তারা সরকার বা পুলিশকে মানবে না ; সেই রাজা হবে। 'হেড-কনস্টেবল ··বেশ কিছু লোকজন সঙ্গে করে এনেছিল ; কিন্তু বীরসার এ ঘোষণার পর তারা তার দলে-চলে গেল···'।[২৬০]

বীরসার এ প্রকাশ্য রাজবিরোধিতার একটা কারণ, 'সর্দারি লড়াই' (১৮৬৯-১৮৮০)-এর সঙ্গে যুক্ত অনেকেই বীরসার দলে যোগ দেয়।[২৬১] বীরসা তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে আন্দোলন শুরু করে, না কি, আন্দোলন শুরু হবার পর তারা এতে যোগ দেয়—তা ঠিক জানা যায় না। তবে আন্দোলনে সর্দারদের ভূমিকা সন্দেহাতীত। 'সাও মুণ্ডারী' বলে বীরসার এক 'দেওয়ান' সর্দারি লড়াইয়ে যোগ দেবার জন্য বেশ কিছুদিন হাজতে বাস করে।[২৬২] বীরসার কোনো-কোনো ঘোষণায় এ লড়াইয়ের কর্মসূচীর প্রভাব সুস্পষ্ট। একটা ঘোষণায় বলা হয়েছিল—কত খরচ করে তারা সরকারের কাছে আর্জি পাঠিয়েছে। কোনো ফল হয় নি ; কেবলমাত্র বিদ্রোহ করলেই তারা সরকারের 'ন্যায়-বিচার' আর তাদের হারানো জমি (ভুঁইহারি) ফিরে পাবে।[২৬৩]

বীরসার দ্বিতীয় আন্দোলনে ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রথম আন্দোলনের সময় বীরসার এ সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার বিশদ বিবরণ মেলে না। পুলিশের কাছে তার এক 'দেওয়ান' দেওকী পাত্তরের সাক্ষ্য থেকে আমরা সামান্য কিছু জানতে পারি।[২৬৪] তার প্রধান কর্তব্য ছিল বীরসার বাণী প্রচার—তার মধ্যে একটা ছিল, মুণ্ডারা 'সৎ জীবন যাপন' করবে ; ভূতপূজা করবে না। বোংগাপূজার উপর বীরসার তীব্র আক্রমণের উল্লেখ করেছেন কুমার সুরেশ সিং।[২৬৫] সাদা শুয়োর এবং সাদা মুরগি মেরে ফেলার নির্দেশও নাকি বীরসা দিয়েছিল।[২৬৬] সমসাময়িক সরকারি দলিলে এর কোনো উল্লেখ নেই।

স্বল্প সময়ের মধ্যে বীরসার 'ধর্মীয়' আন্দোলন যে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে গেল, তার প্রধান কারণ—বীরসার ঘোষিত "ধর্ম" প্রচলিত অর্থে ধর্ম নয়। ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, নৈতিক বিধান—শুধু এসব বীরসার প্রচারের বিষয়বস্তু ছিল না। সিধু-কানুর নূতন ধর্মের মতো এও মুণ্ডাদের ধর্ম থেকে ভিন্ন। বীরসার ধর্মীয় ঘোষণার মূল কথা—এক মহাপ্রলয়ের পর কলুষময় পৃথিবীর আসন্ন বিলুপ্তি ঘোষণার জন্য ভগবানের দূত হিসেবে তার আবির্ভাব। মুণ্ডা ও সাঁওতাল সৃষ্টিতত্ত্বের একটা মূল ধারণা 'মহাপ্লাবন' নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে বীরসার চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। খ্রীষ্টান বীরসা বাইবেলে বর্ণিত প্লাবনের উপাখ্যানের কথাও জানত। বীরসা প্রলয়, মহাপ্লাবন ইত্যাদির কথা বলেছে। তার ধারণায়, এ বিপর্যয় আমূল রূপান্তরের ইঙ্গিতমাত্র। বীরসা তাই সঙ্গে-সঙ্গে বলেছে, এ প্রলয়ে 'সরকারও ভেসে যাবে'। বীরসার স্বপ্নলব্ধ নানা 'সত্য' সম্পর্কে মুণ্ডাদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে একটার তাৎপর্য বীরসা নাকি ব্যাখ্যা করে বলেছিল। তা হল : হারানো মুণ্ডারাজ সে আবার তাদের ফিরিয়ে দেবে।[২৬৭]

বিদ্রোহী মুণ্ডাদের ধর্ম এবং রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য যোগের আর-একটা রূপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আন্দোলনে রাজনৈতিক মেজাজ ক্রমে প্রকট হয়ে উঠলেও মুণ্ডাদের কাছে বীরসা পূর্ববর্তী মুণ্ডা নেতাদের মতো শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতা ছিল না, যার প্রচার এবং ক্ষমতা রাজনৈতিক লক্ষ্যসিদ্ধিতেই সীমাবদ্ধ। বছর খানেক আগেও মুণ্ডাদের কাছে বীরসার

পরিচয় মূলত তাই ছিল—তাদের অরণ্যের অধিকারের উপর সরকারি হস্তক্ষেপ আর বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নেতারূপে। কিন্তু এখন মুণ্ডাদের চেতনায় তার ভাবমূর্তির আমূল রূপান্তর ঘটে। বীরসা এখন অলৌকিকতার স্তরে উন্নীত ; 'ধরতি আবা' (পৃথিবীর পিতা), ভগবান বলেই এখন তার পরিচয় ; অনেকেই তাকে মুণ্ডাদের পরম উপাস্য দেবতা সিং বোংগা (সূর্য-দেবতা) বলে মনে করে, যে দেবতা কোনো অমঙ্গল করেন না, অথচ দূর থেকে তাদের সব কাজ লক্ষ করেন।

বীরসার অনন্যসাধারণ আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীর সত্যাসত্য বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আসল কথা, মুণ্ডারা তাদের নির্দ্বিধায় সত্য বলে মেনে নিয়েছে, এবং ফলে বীরসার মানবিক অস্তিত্ব দেবত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। এরকম এক কাহিনী তখন প্রায় জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছিল। তা লোহারডাগার পুলিশাধ্যক্ষের কানেও আসে।[২৬৮] তা হল : প্রচণ্ড এক ঝড়ঝঞ্ঝার দিনে অন্য এক মুণ্ডার সঙ্গে বীরসা কোথায় যেন যাচ্ছিল। এক তীব্র বিদ্যুতের ঝলকে সহগামী দেখতে পায়, বীরসার মুখের আদলই পালটে গেছে ; যা ছিল ঘনকালো, তা হয়ে গেল লাল এবং সাদা। বীরসাকে সে তা বলে। বীরসা বলে, ভগবান তার কাছে দেখা দিয়েছেন। গ্রামে ফিরে বিস্মিত সহগামী সবাইকে এ কথা জানায়। চতুর্দিকে তা অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

এর মধ্যে এ কথাও জানাজানি হয়ে যায় যে দুরারোগ্য রোগ সারানোর ক্ষমতা বীরসার আছে ; তার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের প্রমাণও নাকি অনেকে পেয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ধরে নিয়েছিল—এসব এক বিকৃতমস্তিষ্ক বা ফন্দিবাজ লোকের কাণ্ড। বীরসা উন্মাদ কিনা, তা জানার জন্য ডাক্তারি পরীক্ষারও ব্যবস্থা হয়। ডাক্তার বলে, তার মাথায় কোনো গণ্ডগোল নেই। 'রাজপুরুষদে'র কেউ-কেউ তখন ভাবল, লোকটা পাকা ফন্দিবাজ। ছোটনাগপুরের কমিশনার ব্যঙ্গ করে বলে, বীরসার রোগ সারানোর ক্ষমতার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত তার জানা আছে—এক অর্ধোন্মাদ প্রলাপভাষিণী মুণ্ডারমণীকে কী সব তুকতাক করে সে সারিয়েছিল।[২৬৯] গ্রামের লোক কিন্তু বীরসার ক্ষমতার কথা সহজ বিশ্বাসে মেনে নিয়েছে। বস্তুত, তাদের অনেকেই এ ক্ষমতার প্রমাণ পেয়েছে। যারা নিরাশ হয়েছে, তারা বীরসায় ক্ষমতায় অবিশ্বাস করে নি। তারা বলত—দোষ তাদেরই ; তারা হয়তো যথেষ্ট শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের মনোভাব নিয়ে তার কাছে যায়নি ; না হলে অন্যরা সুফল পেয়েছে, তারা পেল না কেন? বীরসার দেবত্ব বা অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস এভাবে সুদৃঢ় হয়।

তাই চালকাদে (Chalkad) তার নূতন আবাসে তার "দর্শন" লাভের জন্য কাতারে-কাতারে লোক সেখানে যেতে থাকে। কমিশনারের ভাষায়, 'গ্রামের সব লোক সেখানে জড়ো হয়েছে···তখন দুজন লোকের দেখা হলে তাদের কুশলবিনিময়ের কথা ছিল—চালকাদ গেছ কি ?'[২৭০]

শুধু তাই নয়। মুণ্ডা চেতনায় বীরসার অনন্য-সাধারণ প্রভাবের অন্যান্য দৃষ্টান্ত প্রশাসনকে বিস্মিত করেছিল। ছোটোনাগপুরের কমিশনার জানতে পারে : 'বহু যোজন দূর থেকে অগণিত লোক তার প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে তার কাছে যায় ; চাষবাস ছেড়ে, বাড়িঘর, গবাদি পশু বিক্রি করে তারা চলে আসছে।'[২৭১] সব টাকাপয়সা জল হয়ে যাবে, তাই কাপড়চোপড় কিনে তারা সব সঞ্চয় শেষ করে ফেলুক—বীরসার এ ঘোষণার ফল সম্পর্কে লোহারডাগার পুলিশাধ্যক্ষের প্রতিবেদন : 'বস্ত্রব্যবসায়ীদের কারবার ফেঁপে-ফুলে উঠেছে ; আসল দামের দ্বিগুণ দিয়ে লোকেরা তাদের পণ্য আকুল আগ্রহে কিনে নিচ্ছে।'[২৭২]

মুণ্ডারা বীরসাকে কী দৃষ্টিতে দেখত, বা আবার বোঝা গেল তার গ্রেপ্তারের পর (২৩-২৪ অগস্ট, ১৮৯৫)। সন্ধ্যায় যখন বীরসা এবং অন্য কয়েকজন মুণ্ডাকে লোহারডাগার উপ-কমিশনারের কাছে আনা

হল, 'এক বিশাল জনতা সঙ্গে আসে, কাছারিঘর থেকে তাদের জোর করে বার করে দিতে হয়। সব দরজা বন্ধ করা হয়; বোঝা গেল, এ লোকটার খাম-খেয়ালিপনা কী নিদারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।'[২১৩] খুন্টি থানার সাব-ইন্সপেক্টর লিখছে: 'ভগবান বীরসার গ্রেপ্তার হওয়ার কথা তারা কেউ বিশ্বাসই করে না··· আরো জানতে পেরেছি, ধাঙ্গর হিসেবে অ্যাদ্দিন কাজ করছিল প্রতি গ্রামের এমন সব কোলরা তাদের কাজ ছেড়ে চলে গেছে, তারা বলছে, দু-চারদিনের মতো এত অল্প সময়ের জন্য তারা কাজ করবে না।'[২১৪] তিনদিন পরেও যখন বীরসা ফিরে এল না, সবাই হতাশ, বিমর্ষ হয়ে ফিরে গেল। এক মিশনারির ভাষায়, '···এতে তারা এত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের মুখ দিয়ে কোনো কথা সরেনি।' বিভ্রান্ত তারা হয়েছিল, কিন্তু বীরসার উপর আস্থা হারায় নি। লোহারডাগার পুলিশাধ্যক্ষ খবর পায়; 'তবুও শত-শত লোক রোজ সেখানে [চালকাদে] আসত; আসলে কী ঘটেছে, তা তারা জানতে চায়; 'ভগবান' ফিরে এসেছেন কিনা, তার খোঁজ নেয়। এরা বীরসার শূন্য ঘরেই তার পুজো সেরে আবার বাড়ি ফিরে যায়।'[২১৫]

অকটোবরে বিচার শুরু হলে 'ভগবানের' দর্শনের জন্য তারা যেন উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। লোহার-ডাগার উপ-কমিশনার প্রথমে ভেবেছিল, খুন্টির কোনো জায়গায় বিচার হবে। তার ধারণা ছিল, বীরসার গোটা ব্যাপারটাই বুজরুগি; যে অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলে সে বরাবর মুণ্ডাদের বলে আসছে, আসলে তার তা নেই; মিথ্যা ছলনায় সে মুণ্ডাদের প্রতারিত করেছে; উপ-কমিশনারের উদ্দেশ্য ছিল, খুন্টির মুণ্ডারা নিজের চোখে দেখুক, বীরসার সব কথা কত ভিত্তিহীন। ফল হল ঠিক উলটো। বীরসাকে দেখার জন্য সমবেত বিশাল জনতার হাবভাব দেখে উপ-কমিশনার ভয় পেয়ে যায়। ২৪শে অকটোবর মাঝরাতে কমিশনারকে জরুরি বার্তা পাঠিয়ে বলে, 'জনতা মারমুখী; বহুজনকে তাকে গ্রেপ্তার করতে হয়েছে; খুন্টিতে বিচারের ব্যবস্থা বাতিল; রাঁচীতেই তা করতে হবে; আর অতি সত্বর যেন এক পুলিশ-বাহিনী পাঠানো হয়।' উপ-কমিশনার পরে জানতে পারে, খুন্টিতে বিচার হবে বলে গ্রামে-গ্রামে রটিয়ে দেওয়া হয়; তাতেই এত লোক জড়ো হয়; 'কিন্তু যখন তারা দেখল, ধরতি আবা বীরসাকে তাদের দেখতে দেওয়া হচ্ছে না, তারা চেঁচামেচি শুরু করে দেয়, অশান্তভাবে লাফালাফি আর বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে।'[২১৬]

বীরসা ভগবান, তাই ব্রিটিশরাজের থানা, পুলিশ, আদালতের কোনো এক্তিয়ার তার ওপরে নেই—মুণ্ডাদের এ বিশ্বাস পরেও ভাঙে নি। একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বরে বীরসাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ছটিয়ার হিন্দু মন্দিরে পুজো ইত্যাদি ব্যাপারে হিন্দুদের সঙ্গে মুণ্ডাদের এক বিবাদ উপলক্ষে পুলিশ আবার তাকে ধরতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে নি। এ বিষয়ে মুণ্ডাদের বিশ্বাস সম্পর্কে কমিশনার লিখছে: 'এ অর্ধোন্মাদ লোকটার [বীরসার] নানা উচ্চাভিলাসের মধ্যে একটি হল, সে দাবি করে, সে 'দেওতা'; তার অনুগামীদের মধ্যে একটা প্রচলিত ধারণা ছিল, দিব্যশক্তির ইচ্ছায় কিছু-দিনের জন্য সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে।'[২১৭]

১০.৩

এ আন্দোলনের সঙ্গে বীরসার দ্বিতীয় আন্দোলনের গুণগত পার্থক্যের কথা আগে উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের আলোচনা এ বিশিষ্ট পার্থক্যগুলির বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ। দুই আন্দোলনের মধ্যবর্তী সময়ে মুণ্ডাচেতনায় নূতন লক্ষণের রূপ বোঝা তাতে সহজ হবে। মুণ্ডা-আন্দোলনে ধর্মের ভূমিকাও তখন অংশত পরিবর্তিত হয়েছে।

সামগ্রিকভাবের দেখতে গেলে, গোড়ায় বীরসার রাজনৈতিক দর্শনে যে অনির্দিষ্টতা, অস্পষ্টতা ছিল,

পরবর্তী আন্দোলনে তা প্রায় সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে। বিধ্বংসী এক মহাপ্লাবনে কলুষিত পৃথিবী বিলুপ্ত হবে, এবং এর একমাত্র ব্যতিক্রম—এক নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত বীরসার অনুগামীরা—এ ভবিষ্যদ্বাণী গোটা মুণ্ডামুলুকে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। গুজব রটেছিল—এক নির্দিষ্ট দিনে (২৭ অগস্ট) তুমুল অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে এ প্রলয় ঘটবে। কিন্তু তা ঘটেনি। অধীর প্রত্যাশায় উন্মুখ মুণ্ডারা সাময়িক-ভাবে বিভ্রান্ত বোধ করেছিল। কিন্তু "ধরতি আবা" বীরসার উপর বিশ্বাস কিন্তু অটল থাকল।

মুণ্ডারা সম্ভবত আশা করেছিল, বীরসা তাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত মুণ্ডারাজ ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু বীরসার ঘোষণায় এর কোনো সঠিক নির্দেশ ছিল না। এক পৃথিবীর বিনাশ হবে; কিন্তু বিকল্পের রূপ কী, মুণ্ডারা তা জানত না। তাদের শত্রু কারা, তা নূতন করে বলার দরকার ছিল না। কিন্তু কীভাবে তাদের প্রভুত্বের অবসান ঘটানো যাবে, সে বিষয়ে কোনো কিছু বলা হয় নি। শত্রুবিরোধী 'রাজনৈতিক কার্যকলাপ' যা কিছু ঘটেছিল, তা পূর্ব-পরিকল্পিত রাজনৈতিক কর্মসূচীর অংশ নয়। তাদের উপলক্ষ ভিন্ন। বীরসার প্রচারে বাধাসৃষ্টিকারীদের কাকে-কাকেও শাসানি দেওয়া হয়েছিল, (যেমন বন্দগাঁওয়ের খুদে জমিদার জগমোহন সিং),[২১৮] এমনকী প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছিল, (যেমন কোচাং অঞ্চলের এক সর্দার)।[২১৯] 'ভগবানের' গ্রেপ্তারে প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ মুণ্ডারা বিপুল সংখ্যায় কাছারি আদালতে গিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে; কিন্তু থানা বা আদালতের লোকজনের বিরুদ্ধে হিংসার কোনো ঘটনা ঘটে নি।

পরবর্তী আন্দোলনে বীরসার রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায় সব অস্পষ্টতা কেটে গেছে। নূতন সমাজ গড়ে উঠবে বর্তমান 'কলুষময়' পৃথিবী থেকে দূরে কোথাও নয়; তা গড়ে উঠবে একান্ত প্রত্যক্ষ, সন্নিকট, জীবনের সহস্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপান্তরের মধ্য দিয়ে; কোনো 'মহাপ্লাবনে'র ফলে এ রূপান্তর ঘটবে না; সহিংস প্রতিরোধেই পরাক্রান্ত শত্রুকুল পর্যুদস্ত, নিশ্চিহ্ন হবে। সহিংস সংঘর্ষের অনিবার্যতা সম্পর্কে বীরসার ধারণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরে আমরা দেখব, প্রায় দু বছর ধরে[২৮০] যে মুণ্ডা-সংগঠন বীরসার নির্দেশে গড়ে উঠেছে, তা এ ধারণায় অণুপ্রাণিত।

সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের মূল লক্ষ্য যে মুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠা, এ বোধ প্রথম থেকেই স্পষ্ট ছিল। কিন্তু কোন্ কোন্ শত্রুগোষ্ঠীর উপর কঠিনতম আঘাত হানতে হবে? বীরসা মুণ্ডাদের চিরাচরিত শত্রুদের কথা অনবরত বলেছে। কিন্তু মুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠার পথে ব্রিটিশরাজই প্রধান প্রতিবন্ধক, তার এ ধারণা সম্পর্কে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

মুণ্ডা চেতনায় ব্রিটিশরাজ শুধুমাত্র স্থানীয় প্রশাসন নয়—গোটা য়ুরোপীয় গোষ্ঠী ('সাহেব লোক'), এমনকী মিশনারিরাও। মিশনারিদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় এক দশক ধরে ক্রমেই তিক্ত হচ্ছিল। 'সর্দারেরা সব প্রতারক'—এক জার্মান মিশনারির এ মন্তব্যে মুণ্ডারা তীব্র বিক্ষুব্ধ হয়। বীরসা নাকি এ মন্তব্যের উত্তরে বলেছিল—মিশনারির এ আচরণ অস্বাভাবিক নয়; কারণ, 'সাহেব সাহেব এক টোপী হ্যায়'। মিশনারি হফমানও বলেছেন, মুণ্ডাদের জন্য মিশনের এত আন্তরিকতা, সহানুভূতি তারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে; এমনকী তাঁকে এবং তার এক সহকর্মীকে মুণ্ডারা খুন করতেও চেয়েছে। এর কারণ হিসেবে হফমান বলেছেন: 'শুধুমাত্র আমরা সাদা চামড়ার লোক; তাদের বিশ্বাস, তাদের সব পরিকল্পনায় আমরা বাদ সাধছি।'[২৮১] স্বভাবতই, যেসব খ্রীষ্টান মুণ্ডা তখনও য়ুরোপীয় মিশনের প্রতি অনুগত ছিল বীরসার অনুগামীরা তাদেরও শত্রুদল-ভুক্ত বলে মনে করেছে। বড়দিনের আগের সন্ধ্যায় (২৪ ডিসেমবর) সমবেত খ্রীষ্টানদের উপর আক্রমণ দিয়েই বিদ্রোহ শুরু হয়।

এর তিনদিন পরে এক নূতন ঘোষণায়[২৮২] বিদ্রোহীরা অন্য শত্রুদের চিহ্নিত করে। তারা বলে—মুণ্ডাদের কোনো ক্ষতি তারা করবে না; তাদের লড়াই 'হিন্দু এবং সরকারে'র বিরুদ্ধে; গ্রামের সবাইকে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলেছে। 'সরকারের প্রতি অনুগত মুণ্ডাদের বলেছে, এ মুলুক ছেড়ে সাহেবদের সঙ্গে তারা বিলেত চলে যাক।'

কিন্তু "হিন্দু" শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হিংসা প্রয়োগের ঘটনা বিরল। এর প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে, বিদ্রোহ শুরু হবার পর বিদ্রোহীদের আসল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় পুলিশ আর সামরিক বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করা। থানা আক্রমণের বহু দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত সামরিক বাহিনীর সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব ছিল না। তবুও যেভাবে তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল, তাতে ব্রিটিশ বাহিনীর লোকেরা বিস্মিত হয়েছিল। অদম্য তাদের সংকল্প, দুর্জয় তাদের সাহস। গয়া মুণ্ডা-পরিচালিত মুণ্ডা প্রতিরোধ (৭ জানুয়ারি, ১৯০০) সম্পর্কে রাঁচীর উপকমিশনারের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: 'যে সাহস এবং মরীয়াভাব নিয়ে গয়া লড়াই করেছে, তা আমার কাছে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা।'[২৮৩]

এ দুর্দমনীয় নির্ভীকতার উৎস ছিল তাদের নৈতিক এবং আত্মিক বল, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ এলাকার কর্তৃত্ব ন্যায্যত তাদের; ব্রিটিশরাজের কোনো এক্তিয়ার এখানে নেই। ছোটোনাগপুরের কমিশনার একটা ঘটনার উল্লেখ করে,[২৮৪] ব্রিটিশ-বাহিনী বুঝতে পারে, লড়াই চালিয়ে যাওয়া বিদ্রোহীদের পক্ষে আত্মঘাতী মূঢ়তা মাত্র; তাদের বোঝাতে চেষ্টা করে, তারা লড়াই বন্ধ করে আত্মসমর্পণ করুক। 'প্রতিনিধি হিসেবে তাদের একজন এগিয়ে এল; বেশ খানিকটা দূর থেকে চেঁচিয়ে বলল, রাজ তাদের, আমাদের নয়; যুদ্ধ যদি থামাতে হয়, আমরাই তা করব, তারা নয়; শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে তারা প্রস্তুত।' এ প্রতিরোধ বর্ণনা বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয়। এখানে এটা বলাই যথেষ্ট হবে, এ প্রতিরোধ সুপরিকল্পিত, কারণ রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে বীরসার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল, এবং এ লক্ষ্যসিদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায়গুলি সম্পর্কে তার কোনো সংশয় ছিল না।

বিদ্রোহীদের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট, অমিত তাদের সাহস প্রতিরোধের প্রস্তুতিও যথাসম্ভব নিপুণ। কিন্তু সমগ্র বিদ্রোহটা যেন ক্ষণস্থায়ী তীব্র এক স্ফুলিঙ্গের মতো হঠাৎ জ্বলে ওঠা, আবার সঙ্গে-সঙ্গে নিভে যাওয়া। কারণ ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে পেরে ওঠা অসম্ভব ছিল।

কীভাবে মাত্র দু বছরের মধ্যে এ প্রতিরোধের মানসিকতা গড়ে উঠল, তা বিশ্লেষণ বর্তমান আলোচনায় অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। এখানে ধর্মের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, যদিও আগের তুলনায় এ ভূমিকার রূপ পরিবর্তিত হয়েছে।

১০.৪

বীরসা-মন্ত্রে দীক্ষিত দৃঢ়সংকল্প এক ক্ষুদ্র মুণ্ডা-সম্প্রদায়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলেই এ মানসিকতার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। এ প্রচেষ্টার প্রধানতম দিক সংঘবদ্ধভাবে বীরসার আদর্শ প্রচার।

প্রচারের রীতি ১৮৯৫ সালের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে সময় মুণ্ডারা যেত চালকাদে বীরসার নূতন "আশ্রমে"। এখন বীরসার আস্থাভাজন শিষ্যরাই যাবে মুণ্ডাদের কাছে, এমনকী দূর প্রত্যন্ত অঞ্চলেও; বহুসংখ্যক মুণ্ডার সঙ্গে যোগস্থাপন করে বার-বার বীরসার আদর্শের কথা তাদের বলবে; এভাবেই তার চিন্তার "বীজ"[২৮৫] বহুদূর ছড়িয়ে যাবে।

প্রধানত মিশনারি হফমানের প্রতিবেদন[২৮৬] থেকেই বীরসার এ মন্ত্রশিষ্যগোষ্ঠীর সংগঠন সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি। এ গোষ্ঠীর তিন ভাগ—প্রচারক, পুরানক এবং নানক। প্রচারকরা বীরসার সবচাইতে কাছের লোক; সপ্তাহে দুদিন তারা বীরসার সঙ্গে দেখা করত; রাতে মাঝে-মাঝে মুণ্ডাদের যে গোপন সমাবেশ হত, সেগুলি সম্পর্কে প্রধান দায়িত্ব ছিল তাদের। পুরানকরা সংখ্যায় বেশি; গোটা মুণ্ডা মুলুক থেকে নানা দিক বিচার করে বীরসা তাদের বাছাই করত; তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হফমান লিখছেন, 'প্রকাশ্য সংঘর্ষের সংকল্প থেকে তারা কখনও বিচ্যুত হয় নি।' নানকরা নূতন শিষ্য; হফমানের মতে বিদ্রোহের 'মাস পাঁচেক আগে' তারা বীরসার দলে যোগ দেয়। তারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল; কিন্তু 'গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চায়েতে' তারা যোগ দিতে পারত না।

বীরসার নানা নির্দেশ সম্পর্কে আলোচনার জন্য গ্রামে-গ্রামে মুণ্ডারা জমায়েত হত; বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাত্রে। সম্ভবত গোপনীয়তা রক্ষার জন্য।

এভাবে গড়ে উঠল বৃহত্তর "বীরসা সম্প্রদায়"।[২৮৭] এর সংহতির ভিত্তি বীরসার আদর্শ এবং নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আনুগত্য। স্বভাবতই, যারা বীরসার আদর্শ গ্রহণ করে নি, তাদের সঙ্গে এ সম্প্রদায় ব্যবধান রক্ষা করে চলত। সম্ভবত বীরসা-অনুগামীদের দৃঢ় ধারণা ছিল—শুধুমাত্র নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত মুণ্ডারাই তাদের মুক্তিসংগ্রামের জন্য সবরকম ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে। এ অনমনীয় মনোভাবের জন্য এ নূতন সম্প্রদায়কে হফমান 'হিন্দুজাতিপ্রেথা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন; বস্তুত, তাঁর মতে, এ সম্প্রদায়ের অনুশাসন 'কঠোরতর'। অন্য মুণ্ডাদের সঙ্গে তারা একসঙ্গে বসে খেত না; তাদের, এমনকী, তাদের ছেলেপিলেদেরও তারা ঘরের 'চৌকাঠা মাড়াতে দিত না'। ছোটোনাগপুর কমিশনারের মতে, তারা এক নূতন ধরনের পইতে পরত, যার নাম 'বীরসা পইতে'।[২৮৮]

কোন্ আদর্শ বীরসার ক্ষুদ্র মন্ত্রশিষ্যগোষ্ঠী গ্রামে-গ্রামে প্রচার করত? মুক্তির ব্রতে কীভাবে তারা মুণ্ডাদের উদ্‌বুদ্ধ করত? হফমান বা প্রশাসনকর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে কিছু লেখেন নি। এক অনন্যসাধারণ গবেষণা-গ্রন্থের উপর আমরা এর জন্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।[২৮৯]

বীরসার নূতন বাণীর মূল কথা—মুণ্ডাদের জানতে হবে এককালে তারা কত মহান জাতি ছিল; 'সত্য-যুগের' অবসান ঘটেছে নানা বহিরাগত গোষ্ঠীর চক্রান্তে এবং শোষণে, যার ফলে বর্তমানের দুঃসহ গ্লানি; সে স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনার জন্য শত্রুকুলের উৎসাদন অপরিহার্য, এবং প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ছাড়া তা সম্ভব নয়।

শুধু সামরিক প্রস্তুতি এর জন্য যথেষ্ট নয়; দরকার মুণ্ডাদের আমূল আত্মিক এবং নৈতিক রূপান্তর। এর প্রধান উপায় দুটি: (১) বহু পুরনো ধর্মবিশ্বাস, আচার, সামাজিক বিধিবিধান বর্জন করে মুণ্ডাদের নূতন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে; (২) সমৃদ্ধতর হতে হবে তাদের ইতিহাস-চেতনা।

ভূত-প্রেত-বোঙ্গায় বিশ্বাস, ডাইনিপ্রথা ইত্যাদি বর্জনের কথা বীরসা ১৮৯৫ সালেও বলেছে। কিন্তু সে আন্দোলন মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য টিকে ছিল; তারপর বছর দেড়েক বীরসাকে হাজতে কাটাতে হয়েছে। তাই সংগঠিত কোনো 'ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন' তখন হতে পারে নি। এবারকার চূড়ান্ত সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুতির একটা প্রধান অঙ্গ ছিল এ নূতন সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বান।[২৯০]

ইতিহাসচেতনা সৃষ্টির জন্য শুধুমাত্র প্রচার যথেষ্ট ছিল না। বীরসার পরিকল্পনা ছিল—প্রাচীন মুণ্ডা-কীর্তির সঙ্গে মুণ্ডারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হোক। এর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল তিনটি জায়গা—দুটি মন্দির এবং একটা দুর্গ। মুণ্ডা লোকগাথামতে, সবগুলি মুণ্ডাদের তৈরি। দুটিয়া মন্দির থেকে আনা হল পবিত্র তুলসীপাতা, জগন্নাথপুর মন্দির থেকে চন্দনবাটা; আর নও রত্তন (Naw Rattan) দুর্গের সন্নিকটস্থ অঞ্চল থেকে 'পবিত্র মাটি ও জল'। বিদ্রোহী কোলদের শৌর্যময় প্রতিরোধ (১৮৩১-৩২) নিয়ে রচিত হল গান; গ্রামে-গ্রামে মুণ্ডাদের রাত্রির জমায়েতে সমবেতভাবে তা গাওয়া হল; গৌরবময় মুণ্ডা-

ইতিহাসের এক পর্বের সঙ্গে তারা নিবিড় সান্নিধ্য অনুভব করতে পারল।

বিদ্রোহের মানসিকতা সৃষ্টিতে রাত্রির জমায়েত-গুলির বিশেষ এক ভূমিকা ছিল। শুধু 'প্রচারক' বা 'পুরানক' নয়, 'ভগবান' বীরসার উপস্থিতি, তার ভাষণ, তার রচিত গান মুণ্ডাদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। তার ভাষণ এবং গানের[২৯০] প্রতীকধর্মী শব্দ-চয়ন শ্রোতাদের মনে আসন্ন ব্রিটিশরাজবিরোধী সংঘর্ষের আবহ সৃষ্টি করে। সেখানকার অন্যান্য কোনো-কোনো অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল—রাজ এবং অন্যান্য শত্রুবিরোধী আক্রোশ যেন উদ্দীপিত হয়। যেমন কলাগাছে ব্রিটিশরাজ (রাবণ) এবং মহারানীর (মন্দোদরীর) কুশপুত্তলিকা বানিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হত। মাঝরাত পর্যন্ত এ অনুষ্ঠান চলত মাদল-বাজনা আর নাচের সঙ্গে।[২৯১]

শ্রোতাদের মধ্যে কেউ পরাক্রান্ত ব্রিটিশবাহিনীর বিরুদ্ধে মুণ্ডাদের জয় সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করলে বীরসা অভয় দিয়ে বলত, ব্রিটিশ বুলেট তাদের শরীর ভেদ করতে পারবে না; শরীর স্পর্শ করার আগেই তা জল হয়ে যাবে। তাদের আরো বলা হত, নও রত্তন থেকে আনা 'পুত জল' তাদের গায়ে ছিটিয়ে দিলে তারা অজেয় থাকবে।

মনে হয়, কোনো এক সময় প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ সম্পর্কে বীরসার খানিকটা দ্বিধা ছিল। তার ধারণা ছিল—সংঘর্ষের অনিবার্য ফল হবে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে হিংসার তাণ্ডব। তাতে অপরিমেয় ক্ষতি হবে কৃষিকাজের; অনিশ্চিত হবে মুণ্ডাদের জীবিকা; বিধ্বস্ত হবে তাদের বাড়িঘর। তার বিশ্বাস ছিল, নিষ্ঠার সঙ্গে তার প্রচারিত নূতন অনুশাসন পালন করলে মুণ্ডাসমাজে নূতন প্রাণশক্তির সৃষ্টি হবে। কিন্তু অনেকেই রাজ-বিরোধী সংঘর্ষের সিদ্ধান্তে অটল থাকল—প্রধানত সর্দারি লড়াইয়ের নেতারা। তা ছাড়া, বিগত চার বছরের নানা বিপর্যয়—১৮৯৬-৯৭ এবং ১৮৯৯ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, ১৮৯৮ সালে কলেরা মহামারীর ব্যাপক ধ্বংসলীলা, পরের বছর খরায় আমন শস্যের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি—মুণ্ডাদের অসহিষ্ণু করে তোলে। ২২ ডিসেম্বর, ১৮৯৯ বিদ্রোহের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

গোটা আন্দোলনের মূল প্রেরণা নিঃসন্দেহে বীরসার সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব। তবে ধর্মের ভূমিকা এবার খানিকটা ভিন্ন প্রকৃতির। বীরসার বিশেষ-বিশেষ আলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে যে ব্যাপক জনশ্রুতি ১৮৯৫-এর আন্দোলনের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, এবার তার কিছুই ছিল না। অতিপ্রাকৃত ঘটনা সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী বীরসা করেনি। দুরারোগ্য রোগ বীরসা সারাতে পারে—এরকম কোনো প্রচার এবার ছিল না। মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারের ঘটনাকে বীরসা প্রকাশ্যেই বুজরুকি, লোক ঠকানোর ফন্দি বলে বলেছে।

কিন্তু বীরসার সম্মোহনী ক্ষমতার প্রধান উৎস তার ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এ আন্দোলনকে 'ভগবান আন্দোলন' বলেই অভিহিত করেছে। 'মহা-প্রলয়' সম্পর্কে বীরসার কথা না ফললেও মুণ্ডা চেতনায় বীরসা তখনও ভগবান। 'ভগবানের দূত' বলেই সে নিজের পরিচয় দেয়। রাত্রে মুণ্ডাদের গোপন জমায়েতে একটা প্রধান অনুষ্ঠান ছিল ভগবান হিসেবে বীরসার স্তবগান। যে বিভিন্ন উপায়ে মুণ্ডা-দের মধ্যে বিদ্রোহের মানসিকতা গড়ে তোলা হয়েছিল, তাদের ধর্মীয় অনুষঙ্গ আর আবহ সুস্পষ্ট। মুণ্ডারাজ মুণ্ডা লোকগাথার 'সত্যযুগ'। এক ব্যাপক ধর্মসংস্কারের ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে মুণ্ডাদের নূতন সমাজ ও সংস্কৃতি। বীরসার এমনও ধারণা ছিল, তার নূতন ধর্মীয় অনুশাসন নিষ্ঠার সঙ্গে মানলে সহিংস সংঘর্ষ ছাড়াই মুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। ইতিহাস-চেতনা সৃষ্টির উপায়গুলি মূলত ধর্মীয়। সমবেত দীর্ঘ পথপরিক্রমার পর ছুটো মন্দির থেকে যা আনা হল, তা প্রধানত পূজার উপচার—তুলসী-পাতা ও চন্দন। নও রত্তন থেকে আনা পবিত্র জলের (নীরদ) স্পর্শ মুক্তিসংগ্রামের যোদ্ধাদের ব্রিটিশ বুলেটের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য করবে। [ক্রমশ

সূত্রনির্দেশ ও টীকা

২৫৩. *Papers Relating to Agrarian Disputes* etc.; Vol. I; পৃ ১৪৬; Chotonagpur Commissioner to Govt. of Bengal, 16 January, 1890. Para 5.

২৫৪. Bengal Judicial (Police) Progs.; Nov. 1895; Nos. 38-39; Chotonagpur Commissioner to Govt. of Bengal, 28 Aug., 1895; Para 4. কুমার সুরেশ সিং-এর মতে, চাইবাসায় বীরসা চার বছর থাকে (১৮৮৮-১৮৯০)। *Birsa Munda and His Movement, 1874-1901* (O. U. P., 1983), P. 40.

২৫৫. একই; Chotonagpur Commissioner-এর চিঠি; Para 4.

২৫৫. একই; Para 2.

২৫৬. মূলসূত্র একই; District Superintendent of Police, Lohardaga to Deputy Commissioner of Lohardaga, 26 Aug., 1895.

২৫৭. Bengal Judicial (Police) Progs.; Nov. 1895; Nos. 44-45; Chotanagpur Commissioners to Govt. of Bengal, 6 Sept., 1895, Para 2.

২৫৮. Bengal General Misc. Progs.; Nov. 1896, Nos. 20-21; Chotanagpur Divisional Commissioner's Annual Report, 1895-96, 29 June, 1896; Para 4.

২৫৯. পাদটীকা নং ২৫৬ দ্রষ্টব্য; District Superintendent of Police, Lohardaga-র চিঠি।

২৬০. মূলসূত্রের জন্য পাদটীকা নং ২৫৭ দ্রষ্টব্য; District Superintendent of Police, Lohardaga to Deputy Commissioner of Lohardaga, 4 Sept., 1895.

২৬১. হারানো জমি ফিরে পাবার জন্য ভূইহারদের দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলন 'সর্দারি লড়াই' নামে পরিচিত।

২৬২. ২৬০ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২৬৩. বীরসার বিরুদ্ধে মামলায় সরকার পক্ষের একটা প্রধান অভিযোগ ছিল, তার সঙ্গে সর্দারদের ঘনিষ্ঠ যোগ। এ সম্পর্কে মিশনারি হফমান তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা লেখেন। তিনি নিজে দেখেছেন, 'বীরসা ভগবান'কে দর্শন করতে যাবার জন্য ওই অঞ্চলের সর্দাররাই জনসাধারণকে উৎসাহিত করেছিল; প্রধানত সর্দার-প্রভাবিত গ্রামগুলি থেকে মুণ্ডারা অস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত হয়ে বীরসার দর্শনে যায়। কুমার সুরেশ সিং মনে করেন, বীরসার 'ধর্মীয়' আন্দোলন যে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হল, তার একটা কারণ সর্দারদের "ক্রমবর্ধমান প্রভাব"। (*Birsa Munda and His Movement etc.* পৃ ৫৭)। তবে তিনি বলেন, সর্দারদের ভূমিকা অতিরঞ্জিত করা হয়েছে; বীরসা ও সর্দারদের দৃষ্টিভঙ্গি মোটেই অভিন্ন নয়: 'Birsa, though influenced by the Sardars, was certainly not their mouthpiece' (পৃ ৫৮)।

২৬৪. পাদটীকা নং ২৬০ দ্রষ্টব্য। 'to live good lives and not to do Puja to Bhuts.'

২৬৫. Kumar Suresh Singh, পূর্বোল্লেখিত, পৃ ৫০। এ বই থেকে জানতে পারি, বীরসা সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ যখন বিশেষ কিছু জানত না, সে সময়কার এক জনশ্রুতি পুলিশ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়: 'a sanyasi of the Mundari caste of Chalkad had been exhorting the neighbouring Kols to become strict Hindus and abstain from forbidden articles of food.' (পৃ ৫৩)। সম্ভবত "নিষিদ্ধ আহার্যে"র মধ্যে শুয়োর, মুরগি এবং গোরুর মাংস ছিল।

২৬৬. একই; পৃ ৫৪। এখানে O' Malley'র একটা বিবরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

২৬৭. K. S. Singh, পূর্বোল্লেখিত; পৃ ৪৬।

২৬৮. Bengal Judicial (Police) Progs.; Nov. 1895; Nos. 38-39; District Superintendent of Police, Lohardaga to Deputy Commissioner of Lohardaga, 26 Aug., 1895. পুলিশাধ্যক্ষ আরো একটা জনশ্রুতির উল্লেখ করেছে: Another rumour was that he had left his house suddenly at night, and

having gone out into the jungle, returned shortly after, giving out that God had appeared to him.'

২৬৯. Bengal General Misc. Progs.; Nov. 1896, Nos. 20-21; Chotanagpur Divisional Commissioner's Annual Report, 1895-96; 29 June, 1896; Para 4.

২৭০. একই; এ বিষয়ে মুণ্ডাদের একটা গান কুমার সুরেশ সিং উদ্ধৃত করেছেন; পূর্বোল্লেখিত, পৃ ৫৩। গানের কিছু-কিছু কলি থেকে মনে হয়, তা বীরসা বিদ্রোহের পরে রচিত। যেমন, He has risen like the Sun, he has come up like the full moon, / he does not rise every day, he will suddenly disappear one day.' 'He will suddenly disappear one day', এর মধ্যে যে শঙ্কার ভাব ফুটেছে, তা প্রথম বিদ্রোহের সময় মুণ্ডাদের মনোভাবের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

২৭১. পাদটীকা নং ২৬৮; Chotanagpur Commissioner to Govt. of Bengal, 28 Aug., 1896; Para 2.

২৭২. একই; District Superintendent of Police, Lohardaga, to Deptuy Commissioner of Lohardaga, 26 Aug., 1895.

২৭৩. একই; Deputy Commissioner of Lohardaga to Chotanagpur Commissioner, 27 Aug., 1895, Para 4.

২৭৪. একই; Sub-Inspector of Khunti to Deputy Commissioner of Lohardaga, 29 Aug., 1895.

২৭৫. Bengal Judicial (Police) Progs.; Nov. 1895; Nos. 44-45; District Superintendent of Police, Lohardaga to Deputy Commissioner of Lohardaga, 4 Sept., 1895.

২৭৬. পাদটীকা নং ২৬৯ দ্রষ্টব্য; Para 4.

২৭৭. Bengal General Misc. Progs.; Dec, 1898; Nos. 16-17; Chotanagpur Divisional Commissioner's Report, 1897-98; 18 July, 1898; Para 269.

২৭৮. সরকারি দলিলে জগমোহনকে 'Tenure-holder' বলা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বীরসা-দলের আক্রোশের প্রধান কারণ, সে গোপনে তাদের নানা খবর পুলিশকে যোগাত; অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত খবর।

২৭৯. পাদটীকা নং ২৭৫ দ্রষ্টব্য; Progs. Nos. 38-39; District Superintendent of Police, Lohardaga to the Deputy Commissioner of Lohardaga; 26 Aug., 1895. সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে, বীরসা সর্দারকে আসার জন্য খবর পাঠিয়েছিল; সর্দার এ নির্দেশ মানে নি; তাতেই নাকি বীরসা বলে: "he would have him killed".

২৮০. বীরসা জেল থেকে ছাড়া পায় ডিসেম্বর ১৮৯৭; বিদ্রোহ শুরু হয় ১৮৯৯ সালে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। জেল থেকে বেরিয়ে আসার ঠিক পরেই বীরসা নতুন উদ্যমে সংগঠনের কাজ শুরু করে দেয়। মিশনারি Hoffman-এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা : No sooner was he back than his name flew from village to village. India Home Dept. Progs.; Aug., 1900; No. 335; Rev. J. Hoffman, Catholic Missionary of Sarwada, Thana Kunti, to Chotanagpur Commissioner, 14 Jan., 1900; Para V; [Hoffman-এর চিঠিটা বাঙলা সরকারের কাছে ছোটোনাগপুরের কমিশনারের চিঠির (17 Jan., 1900) Enclosure No. 4]

২৮১. একই; Hoffman-এর চিঠি।

২৮২. একই; " " ।

২৮৩. একই; Deputy Commissioner of Ranchi to Chotanagpur Commissioner; 7 Jan., 1900. এ চিঠিতে গয়া মুণ্ডার দুঃসাহসী প্রতিরোধের বর্ণনা আছে।

২৮৪. একই; Chotanagpur Commissioner to Govt. of Bengal; 10 Jan., 1900; Para 5. ব্রিটিশ-বাহিনী যখন অনন্যোপায় হয়ে গোলা ছোঁড়ে, তখন : 'the insurgents replied with renewed cries of derision, continuing to brandish their weapons and to dare us to do our worst'.

২৮৫. 'Scatterings the seeds'-কথাটি যীশু নানা

'প্যারাবল' (Parable)-এ ব্যবহার করেছেন। খ্রীষ্টান মুণ্ডার উপর বাইবেলের প্রভাব অনস্বীকার্য।

২৮৬. ২৮০ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২৮৭. সরকারি দলিলে 'Birsaites' বলা হয়েছে।

২৮৮. সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে : '...the followers have lately taken to wearing the Birsaite janew (sacred thread)' India Home Dept. Progs.; Aug, 1900; No. 335; Chotanagpur Commissioner to Govt. of Bengal, 12 Jan., 1900; Para 3.

২৮৯. K. S. Singh; পূর্বোল্লেখিত; সবচাইতে মৌলিক অংশ : পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

২৮৯ক. খ্রীষ্টধর্মের প্রচারে প্রভাবিত বীরসার কাছে ভগবান একান্তভাবেই "personal God"।

২৯০. K. S Singh-সংকলিত একটা গানের অনুবাদ :
বড়ো নদীতে বান ডেকেছে; ধুলোর ঝড় উঠছে,
ময়না, পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও।
অরণ্য জুড়ে আগুন আর ধোঁয়া,
ময়না, পুড়ছে তোমার মা;
ভেসে যায় তোমার বাবা,
ময়না···

পূর্বোল্লেখিত; পৃ ৮৮-৮৭।

২৯১. একই; পৃ ৯০।

পাঠকদের প্রতি আবেদন

কাগজ, ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি প্রকাশন সংক্রান্ত সব জিনিসেরই অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির চাপে বাধ্য হয়ে আগামী মে ১৯৮৯ সংখ্যা (বাঙলা নতুন বছরের প্রথম সংখ্যা) থেকে "চতুরঙ্গে"র মূল্য প্রতি কপি পাঁচ টাকার পরিবর্তে ছয় টাকা না করলে পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আশা করি, পাঠকবৃন্দ আমাদের নিরুপায় অবস্থার কথা বিবেচনা করবেন এবং আগের মতোই তাঁদের সহানুভূতি-লাভে আমরা বঞ্চিত হব না।

বড়দা ও আমার তরুণকালের স্মৃতি

সুধীর সেন

৯: দিদির দান

পিসির বাড়িতে

কুমিল্লায় একটানা থেকে আমি অনেকটা হাঁফিয়ে উঠছিলাম। ক্রমাগত আত্মীয়স্বজনের আসাযাওয়া হত। তাঁদের কাছে তখন আমি ছিলাম এক বিশেষ কৌতূহলের বস্তু। তাঁরা আমার কুশলবার্তা জিগ্যেস করতেন। উপদেশ দিতেও কার্পণ্য করতেন না। সংসারেই যে আমাদের স্থান, আর সেখানে থেকেই যে মানুষ অনেক ধর্মকর্ম আর পুণ্যসঞ্চয় করতে পারে, অনেকেই তা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিতেন। আমি তাঁদের সদুপদেশ বিনা প্রতিবাদে শুনে যেতাম। গৃহত্যাগের কারণ বা আশ্রমজীবনের কাহিনী সম্বন্ধে কাউকেই কোনো কথা বলি নি। তাঁদের অনেকেই ভাবতেন: আমাকে হঠাৎ "সন্ন্যাসরোগে" আক্রমণ করেছিল, তাই বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। বহু চেষ্টা করে বড়দা আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনলেন। এখন সবার নজরে থেকে রোগমুক্ত আর প্রকৃতিস্থ হচ্ছি।

এ ধারণার প্রতিবাদ করার কোনো প্রয়োজন বোধ করি নি। তবে কিছুদিন থেকেই অল্প সময়ের জন্য হলেও পরিবেষ্টন বদল করার একটা তাড়না অনুভব করছিলাম। পুজোর ছুটি ঘনিয়ে আসায় সে-তাড়না আরো বেড়ে গেল। ঠিক সে সময় আমন্ত্রণ এল পিসির বাড়িতে যাবার। তক্ষুনি রাজি হলাম। হঠাৎ কেন পিসির বাড়ি যাবার ডাক এল বুঝতে পারি নি। বুঝবার চেষ্টাও করি নি। পরে আঁচ করেছিলাম তার পেছনে ছিলেন খুব সম্ভবত সেই কলকাতার বউদি, আমাদের পিসতুতো ভাই ধীরেনদার স্ত্রী।

বউদি আমার আসায় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করলেন। এবার আমি নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে রান্নাঘরে তাঁর কাছে বসলাম। তিনি নিজহাতে বিধবা শাশুড়ির জন্য কিছু রান্না করছিলেন। কাজ করতে-করতেই আমাকে বললেন, 'সেবার তুমি কলকাতায় আমাদের কাছে এলে, তারপর হঠাৎ চলে গেলে কাউকে কিছু না বলে। তোমার জন্য আমি কিছুই করতে পারলাম না ভেবে আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল।'

আমি একটু চমকে উঠলাম। আমার জন্য কিছু করতে পারেন নি বলে তাঁর ভীষণ খারাপ লেগেছিল, এজাতীয় কথা তো আগে আর কোথাও শুনি নি। হেসে বললাম, 'ভেবো না, বউদি, এবার আর পালাব না। আমি তো এখানে এসেছি নিজের ইচ্ছায়, তোমাদের কাছে ছুটি কাটাব বলে। আমার জন্য অনেক কিছু করার সুযোগ পাবে, করতে হবেও।'

কলকাতায় চোখের দেখার পর বউদির সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। অথচ সেই মুহূর্ত থেকেই যেন তাঁর সঙ্গে আমার একটা নিবিড় ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠল। তার কারণও খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। বউদি আমার অচেনা হলেও তিনি আমার কথা বেশ ভালো করেই জানতেন। দাদারা কলকাতা গেলে তাঁদের কাছেই উঠতেন, তখন আমার কথাও নিশ্চয়ই হত। তা ছাড়া, পিসি ছিলেন বাবার একমাত্র বোন। সেজন্য যোগা-যোগটাও বেশি ছিল।

তাঁর সঙ্গে আমাদের আরো একটি সম্বন্ধ ছিল, সেটি আত্মীয়তার দিক থেকে দূরের হলেও আন্তরিকতার দিক দিয়ে ছিল খুবই কাছের। এই বউদি ছিলেন আমাদের বালবিধবা কাকিমার বোনঝি। সেই কাকিমা থাকতেন অধিকাংশ সময়ই নিজের বাপের বাড়িতে, ভাইয়ের কাছে সিলেটে নিজেদের আদিম বাসস্থান সাতকাপন গ্রামে, কিংবা করিমগঞ্জ শহরে তাঁদের বাসা-বাড়িতে। তা সত্ত্বেও তাঁকে আমরা ছোটোবেলা থেকেই মনে করতাম আমাদের পরম আত্মীয়। বড়দা আর আমি অনেক সময় সাতকাপন-করিমগঞ্জ গিয়ে ছুটি কাটিয়ে এসেছি।

"আমার ছেলেবেলা" প্রবন্ধে বড়দা লিখেছেন, 'কাকিমার বিয়ের আট মাস পরেই আমাদের কাকার মৃত্যু হয় (১৮৯৬ নভেম্বর)। বিয়ের সময় ছাড়া আর কখনো কাকিমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি। আমার জীবনে এই বালবিধবা কাকিমার প্রভাব অপরিমেয়।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয়, ১৭ নভেম্বর, ১৯৮৫)।

আমিও কাকিমার স্নেহ প্রভূত পরিমাণে ভোগ করেছি, বিশেষ করে আশ্রম থেকে ফিরে আসার পরে। তা ছাড়া, কাকিমার এই বোনকেও আমি আমার আপন মাসি বলেই মনে করতাম। দ্বিতীয় বোনের বিয়ে হয়েছিল বিরামপুর গ্রামে, আখাউড়া রেলস্টেশন থেকে আট-দশ মাইল দূরে, বেশ অবস্থাপন্ন বাড়িতে। কাকিমার নাম ছিল অমলা; দ্বিতীয় বোনের নাম খুব সম্ভবত ছিল বিমলা। তাঁরই বড়ো-মেয়ের বিয়ে হয় আমাদের পিসতুতো ভাই ধীরেনদার সঙ্গে। বউদির ডাক-নাম ছিল ময়না।

কাকিমার ছোটোবোনের বিয়ে হয় কুমিল্লানিবাসী নামকরা এক দত্ত পরিবারে। মেসোমশাই কাজ করতেন পাটনায় অ্যাকাউনটন্ট আপিসে। তাঁর নাম ছিল তৃষিতচন্দ্র দত্ত। তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন, পাটনাতে ব্রাহ্মসমাজের নেতা হিসাবে অনেক বছর কাজ করেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্য তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের বহু গান শুনেছি। ১৯২৬ সনে আই. এ. পরীক্ষা দেবার পর ছুটিতে এক-মাস পাটনায় মাসিমার কাছে কাটিয়ে এসেছিলাম। তার এক বছরের মধ্যেই মেসোমশাই ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁরা ছিলেন নিঃসন্তান। বিধবা মাসিমা তখন শান্তিনিকেতনে চলে আসেন ও সেখানে শিশু-বিভাগ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

তখন থেকে এই সর্বজনপ্রিয় সুশীলাবালা দত্ত সবারই মাসি হয়ে দাঁড়ান। আর নিঃসন্তান মাসিমাও শিশুবিভাগের নানাপ্রদেশের শিশুদের আপন সন্তানের মতোই দেখাশুনা করতেন। আমি ছিলাম ছোটো-মাসিমার বিশেষ স্নেহের পাত্র, একরকম পুত্রতুল্য। বিশ্বভারতীতে কাজ করার সময় আমি প্রায়ই তাঁর কাছে যেতাম। একপাল শিশু তখন ছুটে এসে হইচই

করে আমাকে ঘেরাও করে তাদের আনন্দ জানাত। আমিও তাদের সঙ্গে নানারকম খেলায় যোগ দিতাম।

দুইদিকের পরিবারে অত জানাশোনা ছিল বলে অচেনা বউদি যেন এক নিমেষে আমার চেনা হয়ে গেলেন, আর তাঁর সঙ্গে গড়ে উঠল একটা অন্তরের সম্বন্ধ। কয়েকদিনের মধ্যেই সে সম্বন্ধ গভীরতর হল আরো একটি বিশেষ কারণে। আমাদের পাঁচ ভাইয়ের বোন ছিল একটিমাত্র। আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়ো। দিদির প্রতি আমার ছিল অগাধ ভালোবাসা। তাঁর বয়স ছিল চোদ্দ কি তার কাছাকাছি, যখন তাঁর বিয়ে হয়। তখন ভগ্নীপতি বিশ্বেশ্বর দত্ত ছিলেন সিলেট জেলায় চাবাগানের ডাক্তার। আমি কয়েকবারই দিদির কাছে গিয়ে ছুটি কাটিয়েছিলাম। বিয়ের কয়েক বছর পরই দিদির মৃত্যু হয়। ফলে আমাদের পরিবারে নানা দিক দিয়ে ভাঙন ধরে। সে আঘাত আমি সহজে সামলাতে পারি নি। বউদিকে দেখে মনে হল, তিনি যেন সেই হারানো দিদিরই প্রতিচ্ছবি। তাই অনায়াসেই তিনি দিদির স্থান দখল করে নিলেন।

প্রথম দেখাতেই বউদি জানতে চাইলেন—সেবার তাঁদের কলকাতার বাড়ি থেকে আমি কী করে বেরিয়ে গেলাম, কোথায় গেলাম, কী করলাম ইত্যাদি। রান্নার কাজ করার সঙ্গেই সব শুনলেন। কাহিনী শুনে অবাক হয়ে গেলেন। এই হল সূচনা। তারপর থেকে সব ঘটনা তাঁকে বিশদভাবে বলতে হয়েছে, তবে একটানা নয়, কিস্তিতে-কিস্তিতে, তাঁর নানা কাজের মাঝখানে ফুরসতমতো—কখনো বসার ঘরে, অনেক সময় রান্নাঘরে, কখনো বা ছাদের উপরে আর মাঝে-মাঝে নূতন করে শপথ করিয়ে নিতেন যে আর কখনো এভাবে উধাও হয়ে যাব না। এ-জাতীয় কড়ারের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবু তাঁর সস্নেহ ভর্ৎসনা সানন্দে মেনে নিয়ে যখনি বলেছেন তখনি তাঁকে সহাস্যে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

ইতিমধ্যে বউদি আমার নূতন নামকরণ করলেন। তিনি ডাকতেন আমাকে "সাধু" বলে। তাঁর এবং কাকিমার দিকের আত্মীয়-স্বজন মহলে সে নাম বেশ কিছুকাল চালু ছিল। প্রতিদানে আমিও বউদিকে করে দিলাম কেবল "দিদি"।

পুজোর দিনে

পিসির বাড়ি ছিল মস্ত বড়ো, দোতলা দালান, সামনে অনেকটা খোলা জায়গা পুজোর মণ্ডপসহ, তার খানিক দূরেই ছিল বড়ো দীঘি, বাঁধানো ঘাটলা তার চারিদিকে সুন্দর, উঁচু পাড়সহ। সাঁতার কাটার পক্ষে যেমন অপূর্ব তেমনি মাছচাষের পক্ষেও। সেই দীঘির পরই শুরু হল প্রকাণ্ড বিল দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত, যেন একটা ঘোলাজলের সাগর। আর বহু দূরে দেখা যেত সবুজ-গাছে-ঢাকা কয়েকটি গ্রাম দ্বীপের মতো তার বুকে ভাসছে।

বর্ষার জল তখনো সরা শুরু হয় নি। তাই ট্রেনে আখাউড়ার আগের স্টেশনে নেবে নৌকা করে পিসির বাড়ি বিনাউটি গ্রামে এসেছিলাম—স্টেশন থেকে ছ মাইল হবে। শীতের দিনে বিলের জল সরে গেলে মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে আসা যেত। তবে রাস্তা বলে কিছু ছিল না। আমাদের মামার বাড়িও ছিল খুব কাছেই; মুনিয়দ্ধ গ্রামে। একই স্টেশন থেকে যেতে হত, তবে রেল লাইনের উলটো দিকে অনেকটা উঁচু জায়গায়। তাই ওখানে বিলের বালাই ছিল না। কাঁচা সড়ক ধরে ছ মাইল হেঁটে গেলেই মামার বাড়ি পৌঁছনো যেত।

সে অঞ্চলের সঙ্গে ছোটোবেলা থেকেই আমার খুব ভালো পরিচয় ছিল। মামা-বাড়ি যাবার সড়ক ধরে ছ মাইল সোজা উত্তর দিকে গেলেই ছিল গুরুহিত গ্রাম, আমার মাসির বাড়ি, যেখানে থেকে আমি তিন বছর কসবা স্কুলে পড়েছিলাম। সে সময় আমি বেশ ঘন-ঘন হেঁটে মামা-বাড়ি চলে যেতাম, অনেক সময় স্কুলের এক সহপাঠী আত্মীয় বন্ধু পবিত্র সেনের* সঙ্গে। সুবিধা পেলে পিসির বাড়িও যেতাম।

পিসির বাড়ির ভিতরটাও ছিল খুব সুন্দর। দালানের পরেই মস্ত বড়ো উঠোন, তার তিন দিকে কয়েকখানি সুন্দর ঘর, তার পরেই নানারকম ফুল আর ফুলের গাছ। দালানের গায়েও ছিল কিছু ফুলের গাছ, বিশেষ করে জুঁই ও হাসনুহানা। আশেপাশে ছিল কয়েকটা সুন্দর শেফালি গাছ, সকালবেলা মনে হত যেন সে গাছগুলোর নীচে কে গোল করে শেফালি-ফুলের কার্পেট বিছিয়ে রেখে গেছে।

পিসির বাড়ির পাশেই ছিল তাঁর ভাসুরের বাড়ি, ঠিক একই ধরনের দোতলা দালানসহ। দুই সংসার আলাদা হলেও কোথাও কোনো দেয়াল বা বেড়া ছিল না। তাই দুবাড়ির মধ্যে অবাধ যাতায়াত চলত। পুজোর সময় তো কথাই নেই। মণ্ডপে বড়ো দুর্গা-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করে দুই বাড়ির সবাই মিলে বিশেষ ঘটা করে পুজো করত। তখন কিছুদিনের জন্য দুই সংসার এক হয়ে যেত। বাড়ির লোক, আত্মীয়স্বজন, ভৃত্যবর্গ নিয়ে বাড়ি গমগম করত। তার সঙ্গে ছিল জনস্রোত, বাইরে থেকে প্রতিমাদর্শনের জন্য ক্রমাগত লোক আসাযাওয়া করত।

দিদি ছিলেন বাড়ির বড়ো ছেলের বউ। তাই সংসার পরিচালনার ভারও ছিল তাঁরই উপর। আমি দিনের পর দিন মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছি তিনি সে দায়িত্ব কত সহজে—নিখুঁতভাবে বহন করে গেছেন, সবাইকে অল্প কথায় কাজে লাগিয়ে আর নিজে একগাদা কাজের ভার নিয়ে। তাঁর কাজের গতি ছিল দ্রুত, অথচ অচঞ্চল।

দিদির সেই ছবি আজও আমার চোখের সামনে ভাসে—দায়িত্বশীল, করিৎকর্মা, বুদ্ধিমতী, রূপসী, মিষ্টভাষী, স্নেহপরায়ণ, উদার, সংস্কারমুক্ত, আধুনিক, বিশেষ করে তখনকার চিন্তাধারার তুলনায়। আমার দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন অনায়াসে আদর্শরমণীদের পর্যায়-ভুক্ত। সব কাজের মধ্যেও আমাকে যথাসাধ্য কাছে রাখতেন আর সব কথা তন্নতন্ন করে জানতে চাইতেন। সেবার পুজোর দিনে তাঁর কাছে আমিই যেন ছিলাম প্রধান অতিথি! আমিও তাঁর সঙ্গলাভের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতাম, এমন দরদি শ্রোতা পেয়ে নিঃসংকোচে মন খুলে সব কথা তাঁকে বলতাম। তাঁর বেদনাক্লিষ্ট ছলছল দৃষ্টি বহুবার দেখেছি। অস্বীকার করতে পারিনে যে তখন আমারও সন্ধ্যাসধর্মের বর্ণ ভেদ করে অশ্রু উদ্বেলিত হয়ে উঠত।

বাইরে ছিল পুজোর হট্টগোল, গল্পগুজব, হাসি-তামাসা, যথাসময়ে খোলকরতাল নিয়ে ভজন-কীর্তন, আরতি, পুষ্পাঞ্জলি। আর তার সঙ্গে ছিল সেই মর্মঘাতী, অমানুষিক দৃশ্য—পাঁঠাবলি! যখনি সে দৃশ্য দেখেছি তখনি আমার "বিসর্জনে"র কথা মনে হয়েছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে ভেবেছি মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে কিভাবে অভ্যাসের দাস হয়ে অমানুষিক কাজ করতে পারে।

আশ্রম পরিত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গেই আমি মনে-মনে দেবদেবীবহুল পূজা-অর্চনায় ভারাক্রান্ত হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করেছিলাম। তবে পুজোর দিনে মণ্ডপের দিকে একেবারেই না গেলে বিসদৃশ দেখাবে, তাই দিনে কয়েকবার সেখানে গিয়ে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসতাম। উদ্দেশ্য ছিল শুধু বাহ্যিক শোভনীয়তা। মণ্ডপে বসলেও সেদিন আমার সমগ্র অন্তর দখল করে ছিল দেবতা নয়, মানুষ; দুর্গা নয়, দিদি। যখনি সময় পেয়েছি, চুপে চুপে বসে কবিতা লিখেছি দিদির জন্য। প্রথম কবিতার নাম ছিল "মায়ের জাতি"। নীচের কয়েকটি লাইনে তখনকার মনোভাবের ছাপ রয়েছে:

* * * *

স্বার্থবিহীন যত্নে যাঁদের মানুষ শুধু "মানুষ" হতে পারে

* তিনি বহু বৎসর বিহারে হর্টিকালচার নিয়ে অনেক মূল্যবান রিসার্চ করেন, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বটানির প্রফেসার নিযুক্ত হন ও সে সময় "সেবাভারতী"র প্রতিষ্ঠা করেন।

নিষ্ঠুরেরা অত্যাচারে জর্জরিত করছে আজি তাঁরে।

* * * *

মুক্ত আলো মুক্ত বায়ুর সঙ্গে তাঁদের নাই যে পরিচয়,
তাই তো আজি অশান্তি ঘোর,
তাই তো তাঁদের জীবন দুঃখময়।
নিজের রোগে অস্থিধায় নাই তোমাদের দৃষ্টি ক্ষণেক তরে,
পরের দুখে গভীর শোকে জীবন-ভরা নয়নবারি ঝরে।
পরের সেবা লক্ষ্য শুধু, পরের দুখে পাও মা ব্যথা প্রাণে,
প্রাণ আছে যার প্রাণ তোমাদের সেই জানে মা,
আর কে বলো জানে।
পরের তরে প্রাণ দিতেছ, দিচ্ছ নিতি সাধের জীবনখানি,
তার ফলে আজ তোমাদেরে রাখছে করে কেবলি চাকরানী!

* * * *

এর প্রতিকার আর কিছু নাই দেখেছি মা
অনেক ভাবি ভাবি—
তোমাদেরই চাইতে হবে, করতে হবে নিজের সুখের দাবী।
স্বার্থপরে ক্ষণেক তরে নেয় না কভু খোঁজ তোমাদের যেথা
সেথায় আজি মুখটি ফুটে তোমাদেরই বলতে হবে কথা।
তাই বলি আজ লজ্জা রাখো, তাই তো বলি চাইতে শেখো,
মাগো।
বহুদিনের নিদ্রা ছেড়ে তাই তো বলি তোমরা আজি জাগো।

১২ই আশ্বিন, ১৩২০ বাং
নবমী পূজা, বিনাউটি

দিন দুই ধরে এই কবিতা লিখে নবমীপুজোর দিন দিদির হাতে তুলে দিয়েছিলাম মনে-মনে আমার প্রীতির অঞ্জলিরূপে।

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে মনে হত, আমি যেন সেই মরুতুল্য আশ্রম ছেড়ে এক স্বর্গে চলে এসেছি। আর সেখানে যেন এক দেবী দিদিরূপে এসে দিনের পর দিন অপরিমেয় স্নেহসুধা ঢেলে আমার অন্তরের পুঞ্জীভূত জ্বালাযন্ত্রণা মিটিয়ে দিয়ে গেলেন।

পরের দিন বিজয়াদশমী। মণ্ডপের সমারোহে একটু মন্দা দেখা দিল। সবারই মনে যেন আনন্দ-উৎসবের সঙ্গে বিসর্জনের বেদনাবোধ জেগে উঠল। বিকেল থেকে শুরু হল বিদায়পর্ব। সন্ধে হবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রতিমাকে তোলা হল একটি বড়ো নৌকোতে, তাকে সুন্দর করে সাজিয়ে ও গ্যাসের আলোতে যথা-সম্ভব উদ্ভাসিত করে। পাঁচ-ছটি নৌকোতে ডুবাড়ির প্রায় সব্বাই উঠে বসলেন। তখন অবশ্য ছোটোদেরই জয়জয়কার, সবে মিলে আনন্দধ্বনিতে যাত্রা মুখর করে তুলল। আমিও মিছিলে যোগ দিলাম, তবে ধর্মপ্রণোদিত হয়ে নয়, একান্তই ঔৎসুক্যের বশে সবটা ঘটনা আদ্যোপান্ত স্বচক্ষে দেখার জন্য। দিদি যোগ দিলেন না সংসারের কাজ সামলাতে হবে বলে, বিশেষত বিসর্জনের পরে সদ্যঃপ্রত্যাবৃত্ত ভক্তবৃন্দের যথারীতি সংবর্ধনা করা, প্রসাদ বিতরণ করা আর তাদের নৈশভোজনের আয়োজন করা—সব-কিছুরই ভার ছিল তাঁর উপর।

বিলের উপর দিয়ে অভিজ্ঞ মাঝিরা লগির সাহায্যে সহজেই নৌকো চালিয়ে চলল। কলধ্বনিতে তখন চারিদিক মুখরিত। আকাশ পরিষ্কার, তারাগুলো সবেমাত্র ফুটে উঠছে। চারদিকে জল, শুধু জল। খানিক পরেই বিলের উপর দেখা গেল আরো কয়েকটি বিসর্জনের মিছিল, আলো জ্বালিয়ে প্রতিমা নিয়ে তারাও চলেছে একই দিকে। ধীরে ধীরে মিছিলের সংখ্যা বাড়তে লাগল। আলোর ঘটা দেখে মনে হল হঠাৎ যেন এই বিশাল বিলের উপর দেওয়ালির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিসর্জনের নির্দিষ্ট স্থান ছিল তিস্তা নদী। আমাদের সবশুদ্ধ লেগেছিল দেড় ঘণ্টার মতো বাড়ি থেকে তিস্তায় পৌঁছতে। সেখানকার দৃশ্য ছিল অপূর্ব। অত দুর্গাপ্রতিমা আগে কখনো দেখি নি। হয়তো দেড়শ থেকে দুশ প্রতিমা সেদিন সেখানে জড়ো হয়েছিল। অত আলোতে মনে হল যেন নদীর জলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। হুলুস্থুলের অন্ত নেই—কোথাও উলুধ্বনি, তাকে ছাপিয়ে শঙ্খধ্বনি আর কাঁসর-ঘণ্টার বিকট শব্দ; কোথাও খোলকরতাল-সহ প্রাণ ঢেলে গলা ছেড়ে ভজনকীর্তন; দু-একটি নৌকায় ভাবের আতিশয্যে করতাল হাতে বেতাল নৃত্য ও সঙ্গে-সঙ্গে নৌকো টলমল; অনেক প্রতিমার

সামনেই থেকে-থেকে আরতির ঘণ্টা; কিছু-কিছু বয়োবৃদ্ধ ভক্ত নৌকোতে সমাসীন হয়ে নিবিষ্ট মনে মন্ত্রজপ বা স্তোত্রপাঠে মগ্ন।

ঘণ্টা দুই কেটে গেল। এবার বিসর্জনের সময় ঘনিয়ে এল। উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি আর কাঁসরঘণ্টার সমন্বয়ে নৈশ আকাশ বিদীর্ণ হয়ে গেল। তখন প্রায় একই সঙ্গে সব নৌকো থেকে প্রতিমাকে ধরে-ধরে ঠেলে জলে বিসর্জন দিল। মিনিট পনেরোর মধ্যেই সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ যেন সেখানে অমাবস্যা নেবে এল। মাকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে ছোটোবড়ো সবাই মাতৃহারা সন্তানের মতো বিষণ্ণ ও অবসন্ন মনে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

আমার চোখ ছিল এই বিসর্জনলীলার উপর, কিন্তু আমার মন ছিল অন্য লোকে। তার ফলে হল "সংসার" কবিতা:

সংসার, তুমি আমার হৃদয়প্রিয়।
চিরদিন তব মধুর মূর্তি চক্ষে ধরিয়া দিয়ো।
হাজার দুঃখবিপাকে……
রাখিয়ো ঘিরিয়া আমার জীবনটাকে।
তোমার স্নেহের শক্ত বাঁধন চাহি না ছিঁড়িতে আর,
শান্তির লাগি চাহি নাক যেতে বিশ্বের পরপার।
ছাড়িয়া তোমার স্নেহ-উপহার
ভিখারি সাজিতে চাহি না মা আর
সম্বল করি তুচ্ছ উত্তরীয়।
সংসার, তুমি আমার হৃদয়প্রিয়।

* * * *

সংসার, তোমা প্রাণ হতে ভালোবাসি,
তাই ঘুরে-ফিরে তোমারি বক্ষে আসি।

* * * *

এবার তোমার বুকের ওপর আমার স্বর্গবাস,
তোমারে ঘিরিয়া থাকিব, এবার এই আজি মোর আশ।
চাহি না স্বর্গ, নহি মা মোক্ষ-আশী।
সংসার, তোমা প্রাণ হতে ভালোবাসি।

১৩ই আশ্বিন, ১৩২৯ বাং
বিজয়াদশমী, বিনাউটি

এই কবিতা হল পুরনো প্রতিশ্রুতিরই পুনরুক্তি—দিদির কাছে আর নিজের কাছে। সেদিন রাত্তিরে তা শেষ করে দিদির হাতে তুলে দিয়েছিলাম আমার বিজয়াদশমীর অর্ঘ্যরূপে।

নৌকো ডুবি

পুজোর ধুম কেটে গেল, বাড়িতে জীবনযাত্রাও প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এল। চার-পাঁচ দিনের উৎসব যেন একটা ঝড়ের মতো বয়ে গেল, অথচ তা আমাকে বিশেষ স্পর্শ করে নি। 'সকলের মাঝে থেকে আছ তুমি স্থিরতার চির অন্তঃপুরে'—আমার অবস্থা ছিল অনেকটা সে-জাতীয়। আমি ছিলাম সেই মহোৎসবের অনাসক্ত দর্শক, অংশীদার নয়। দিদি তা বুঝতে পেরেছিলেন, তবে কিছু বলেন নি বা মনেও করেন নি। আমার নিজের খেয়ালমতো চলি, যা ভালো লাগে তাই যেন করি, তিনি নিজেও তা-ই চেয়েছিলেন।

বিজয়ার দু দিন পরে দ্বাদশীর দিন বাড়ির বাইরে একটু একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। দীঘির পাশে নৌকোঘাটে এসে হাজির হলাম। তখনো বেশ কিছু বেলা ছিল। দেখলাম, ঘাটে কয়েকটি মৌকো লাগানো রয়েছে, লগিসহ। হঠাৎ খেয়াল চাপল, একটা নৌকো নিয়ে বিলে গিয়ে ঘুরে আসি। মাঝিরা কিভাবে লগি ফেলে কত সহজে জলের উপর দিয়ে যায়, তা তো বহুবার দেখেছি; মাত্র দুদিন আগে প্রতিমা নিয়ে যাবার সময় আবার নূতন করে তা দেখেছি। আমিই কেন সেভাবে নৌকো চালাতে পারব না? এতে ভাববার আছে বলে মনে করি নি।

একটা মাঝারি সাইজের নৌকো বাছাই করে নিলাম। ঘাটের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। তার গেরো খুলে নৌকো এবার জলে ভাসিয়ে দিলাম। তারপর লগি হাতে নিয়ে মাঝি সাজলাম। মাঝিরই অনুকরণে জলে লগি ফেলে মাটিতে জোরে গুঁতো মেরে চলা শুরু করলাম। নৌকো বেশ ভালোভাবেই এগোচ্ছিল, তবে খুব বাধ্যভাবে নয়, সোজা না গিয়ে

খানিকটা বেশি ডানে কি বাঁয়ে হয়ে যাচ্ছিল। যা হোক, এভাবে ঘাট থেকে বেশ অনেকটা দূরে চলে গেলাম।

মস্ত বড়ো বিল। চারদিক ফাঁকা, জল ছাড়া আর কিছু নেই। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া বইতে শুরু করল, নৌকোটাকেও অনেকটা ঘুরিয়ে দিল। লগি দিয়ে তাকে সামলাতে চেষ্টা করলাম। বিশেষ ফল হল না। ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে, চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি নৌকো ঘুরিয়ে ঘাটে ফিরে যাব ভাবলাম। সে সময় শুরু হল প্রচণ্ড ঝড় আর বৃষ্টি। উলটোদিকের হাওয়া এসে নৌকোকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল আরো দূরে। এবার বেগতিক হয়ে লগি মারলাম গায়ের জোরে, তাই দিয়ে নৌকোকে সামলাব বলে। কিন্তু ফল হল উলটো। লগি গেল মাটিতে গেঁথে আর ঝোড়ো হাওয়ায় নৌকো দিল ঘুরিয়ে, আমার হাত থেকে ফসকে লগি থেকে গেল কয়েক হাত দূরে। সঙ্গে-সঙ্গে নৌকো কাত হয়ে গেল জলে ভরে।

এবার বিপদের মাত্রা ভালো করেই বুঝলাম। নৌকো-লগি ফেলে সেই অন্ধকারে যাত্রা করলাম ঘাটের দিকে সাঁতার কেটে। জলের ঠিক নীচেই এত ঘাস যে সাঁতার কাটাও ছিল কঠিন। বোধ হয় সেই ঘাসের অধিকাংশই ছিল বর্ষাকালের জন্য বিলের নীচু জমিতে বোনা ধানগাছে। সেই জলমগ্ন জঙ্গল বেয়ে আসতে গিয়ে হাঁফিয়ে উঠছিলাম। বাধ্য হয়ে মাঝে-মাঝে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছি। সেখানে তখন ছিল বুকজল কি গলাজল। তাই মাটির উপর, আসলে কাদার উপর দাঁড়াতে পেরেছি। কিন্তু সেই জলজ উদ্ভিদের আবেষ্টন ভেদ করে দু-চার পার বেশি এগোতে পারি নি। তাই সাঁতারের উপরই নির্ভর করতে হল।

সেই ঝড়বাদলের রাতে অনেক লড়াই করে এসে পৌঁছলাম নৌকোঘাটে, তবে নৌকোছাড়া। বুঝলাম মস্ত বড়ো বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। এবার মনে এল অন্য ভয়—কী করে বাড়ির ভিতরে যাব। আমার আপাদমস্তক সপসপে ভিজে, বিলের ঘোলা জলে জামাকাপড় অনেকটা গেরুয়া রঙ ধারণ করেছিল, আর তার উপর ছিল ঘাস, লতাপাতা, শ্যাওলা। ঝেড়ে-মেড়ে কিছুটা পরিষ্কার করলাম। তারপর চুপি-চুপি সোজা গিয়ে হাজির হলাম দিদির কাছে। ভাগ্যিস তখন ওখানে আর কেউ ছিল না।

আমাকে দেখে দিদি মাথায় হাত দিলেন, 'এ কী কাণ্ড! কী হল তোমার? কোথায় গিয়েছিলে তুমি?' আমার পাগলামির কথা তাঁকে বললাম, মস্ত বড়ো অন্যায় করেছি, তাও বললাম। দিদির তখন আর সেদিকে মন নেই। তাড়াতাড়ি গরম জল করলেন, তারপর আমাকে স্নানের ঘরে নিয়ে সাবান-জল দিয়ে ঘসে-ঘসে সারা গা, মাথা পরিষ্কার করে দিলেন। আমার গঙ্গাস্নান শেষ হল। এবার পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিয়ে আমাকে সোজা বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন, পরিপাটি করে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। বললেন, 'এবার তুমি এখানেই শুয়ে থাকো, আর উঠবে না।'

আমি ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'নৌকোটার কী হবে, দিদি? আমি যে সেটা বিলে ফেলে এসেছি। শুনলে আমাকে যে সবাই বকবে।'

দিদি বললেন, "তুমি নৌকার জন্য কিছু ভেবো না। তোমাকে কেউ-কিছু বলবে না। এখন তুমি ভালো করে বিশ্রাম করো, কিছুক্ষণ ঘুমোও।' সেই-আসুরিক পরিশ্রমের পরে এ আদেশ পালন করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় নি। সহজেই ঘুম এসে গেল। সময় সম্বন্ধে তখন আমার কোনো ধারণা ছিল না, তবে মনে হল যেন অনেকক্ষণ ঘুমুলুম।

যখন জাগলাম, তখন দিদির হাত আমার কপালে। তিনি বসেছিলেন আমার পাশে পথ্য নিয়ে। বললেন, 'তোমার বেশ জ্বর এসেছে। সে আশঙ্কাই আমি করেছিলাম।' বিছানায় শুয়েই পথ্য গ্রহণ করলাম। দিদি বললেন, ডাক্তারকে খবর

দেওয়া হয়েছে। শীগগিরই আসবেন, পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়ে যাবেন। আবার ভালো করে আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে ঘুমুতে বলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার এলেন, নাড়ীনক্ষত্র দেখলেন। বললেন, জ্বর খুব বেশি, তবে সঙ্গে আর কোনো উপসর্গ নেই, তাই তিনি আশা করেন যে জ্বর দিন দুয়েকের মধ্যে সেরে যাবে। তবে জ্বর একেবারে সেরে না যাওয়া পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে, তরল পথ্য খেতে হবে। একটা মিক্‌স্‌চারেরও ব্যবস্থাপত্র দিয়ে গেলেন।

ওষুধ এল। দিদিই নিজ হাতে ঢেলে আমাকে দিলেন। ওষুধ খাওয়ার পর আবার তাঁর সেই সাদর হুকুম, 'এবার তুমি ঘুমোও, বেশ ভালো করে। হয়তো কাল সকালেই জ্বর অনেক কমে যাবে।'

আমার মন ছিল সেই বিলে। বললাম,'নৌকোটার কী হবে, দিদি? সকালে যখন সবাই এ ঘটনার কথা শুনবে, তখন তারা আমাকে কী বলবে?'

দিদি আবার জোর করে বললেন,'তোমাকে কেউ কিছু বলবে না, বলতে দেব না, যা ব্যবস্থা করার সব আমি নিজে করব। তুমি সেজন্য বিন্দুমাত্র ভেবো না। এখন তুমি ভালো করে ঘুমোও, লক্ষ্মীটি, যেন তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পার।' বলে ধীরে-ধীরে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন।

সে রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাবছিলাম নিজের ভাগ্যের কথা। সেই ঝড়ের দুর্যোগে বিলের উপর দিয়ে অতটা পথ কী করে পার হয়ে এলাম ভেবে আশ্চর্য হলাম। সাপের কামড়, অন্য জীব-জন্তুর আক্রমণ, লতাপাতার আবেষ্টন, ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে লড়াই করার নিছক ক্লান্তি—সেদিন একটা অঘটন ঘটবার সুযোগ যথেষ্টই ছিল। আমার ভাগ্যবিধাতার কাছে মনে-মনে কৃতজ্ঞতা জানালাম।

তারপরে মনে হল আশ্রমের কথা। একদিন কয়েকটা বাটি-গেলাস ভেঙেছিলাম বলে গুরু আমাকে নিষ্ঠুরভাবে গাল দিয়েছিলেন, আমাকে নগণ্য, অকর্মণ্য বলে তাড়াতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে বাটি-গেলাসই ছিল মূল্যবান, আমি ছিলাম তুচ্ছ। আর আজকে? আমি বিলে নৌকো ডুবিয়ে এসেছি, সেজন্য দিদির বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, তাঁর কাছে নৌকোর চেয়ে আমিই হলাম ঢের বড়ো, আমার জন্যেই তিনি ব্যাকুল। অন্ধকার ঘরে শুয়ে-শুয়ে বার-বার চোখ মুছলাম।

এক বছর আশ্রমে ছিলাম, কলকাতার নঠে আর মাধাইপুরের সদ্যপ্রতিষ্ঠিত "তীর্থস্থানে"। আশ্চর্য এই যে একদিনের জন্যও অসুস্থ হই নি, একদিনও কাজে কামাই করি নি। অথচ তার আগে আমি কত ভুগেছি। গ্রামে মাসির বাড়িতে যাবার কয়েক মাস পরই আমাকে ম্যালেরিয়ায় ধরে। গা কেঁপে জ্বর আসত, ধাঁধাঁ করে ১০৫ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠে যেত, তখন কাঁথা মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে হত। কোনো-কোনো সময় তিন-চার দিন একটানা জ্বর থাকত। মাঝে-মাঝে দেখা দিত পালা-জ্বর, একদিন থেকেই চলে যেত; আবার চব্বিশ ঘণ্টা বাদেই ফিরে আসত। মাসি নিজে কিছু চিকিৎসা করতেন। আম গাছের গা থেকে হলদে লতা এনে তা দিয়ে হার বানিয়ে গলায় পরিয়ে দিতেন। তা ছাড়া অন্য একটা গাছের পাতা এনে তা দিয়ে বালা বানিয়ে হাতে পরিয়ে দিতেন। মাসির এ চিকিৎসা অগ্রাহ্য করার সাহস ছিল না। তাই কিছুকাল তা মেনে নিতে হয়েছিল।

ডাক্তার এসে অবশ্য অন্য ওষুধের ব্যবস্থা করে-ছিলেন। মনে আছে তখন এড্রুয়ার্ডস্ টনিক আমাকে দিনে তিন-চার বার করে গলাধঃকরণ করতে হয়েছে। এ টনিক যে কত বোতল খেয়েছি তার অন্ত নেই। এটা তখন আমার নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গ্রাম থেকে কুমিল্লা যাবার সময়ও এ বোতল যত্ন করে সঙ্গে নিয়ে যেতাম।

গ্রাম ছাড়ার পরও ম্যালেরিয়া আমাকে ছাড়ে নি। কয়েকবার দিদির কাছে ছুটিতে চা-বাগানে

গিয়েছিলাম। সেখানে প্রত্যেক বারই ম্যালেরিয়া এসে আমাকে চেপে ধরেছিল। ডাক্তার জামাইবাবু নিজের ডিসপেনসারিতে তেতো ওষুধ বানিয়ে দিতেন। তাতেই জ্বরের উপশম হত; ছুটির আনন্দ অন্তত আট-আনা উপভোগ করতে পারতাম।

গুরুর আশ্রমে যদি আমাকে এ-জাতীয় রোগে ধরত তা হলে কী উপায় হত? ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। গুরু হয়তো তখন আমাকে ঠেলে দিতেন চিরমুক্তির পথে, সংসারের পরপারে। তবে পাছে আশ্রমের দুর্নাম হয় সে ভয়ে হয়তো বাড়িতে খবর পাঠাতেন আমাকে রুগ্ন অবস্থায় ফিরিয়ে নেবার জন্য। কে জানে!

মনে হল আমার পরম ভাগ্য যে আমাকে এ-জাতীয় সংকটের সম্মুখীন হতে হয় নি। দিদির কাছে জ্বরে পড়ে মনে হল যেন বিলাসিতায় ডুবে আছি। আদরযত্নের অন্ত নেই। তাঁর দৃষ্টি সব সময় আমার উপর। তাঁর কাছে থেকে অসুখে পড়াও যেন পরম সুখ।

ভাগ্যক্রমে বিশেষ কোনো উপসর্গ দেখা দেয় নি। জ্বর সহজেই ছেড়ে গেল। দুদিনেই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলাম।

বিরামপুরের পথে

পুজোর দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর দিদির কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন। তাই ঠিক হল তিনি বিরামপুর যাবেন তাঁর মায়ের কাছে। আমিও ঠিক করলাম একই সময় পিসির বাড়ি ছেড়ে কুমিল্লা ফিরে যাব।

হঠাৎ দিদি এসে আমাকে বললেন, 'সাধু, তোমার তো এখনো স্কুল খোলার বেশ কয়েকদিন বাকি আছে। চলো না আমার সঙ্গে বিরামপুরে, ওখানে আমাদের কাছে কয়েকদিন থেকে কুমিল্লায় ফিরে যাবে তোমার ছুটি ফুরোবার সঙ্গে সঙ্গেই। যাবে?' দিদির সঙ্গে আরো কয়েকদিন কাটাবার প্রলোভন সামলানো কঠিন ছিল। সানন্দে রাজি হলাম।

পরের দিন বাড়ির ছোটবড় সব্বার কাছ থেকে বিদায় নিলাম, যথারীতি প্রণাম করে, প্রণাম নিয়ে। আমি এসেছিলাম বলে সবাই আনন্দ প্রকাশ করলেন। পিসির তো কথাই নেই—বুঝলেন এখন আমার সুমতি হয়েছে, আর পালিয়ে আশ্রমে যাব না; তা ছাড়া বউমার সঙ্গে আমার অতখানি ভাব যে তাঁর সঙ্গে আমি সারাদিন নৌকা করে তাঁর বাপের বাড়ি যেতে রাজি।

তখন হয়তো বেলা দশটা হবে। ঘাটে গিয়ে সুন্দর করে সাজানো একটি নৌকোতে উঠলাম। বাড়ির পুরনো মাঝি, পুরনো ঝি, দিদি আর আমি—এই হল সওয়ারি।

নৌকো ছেড়ে দিল। পাড়ে দাঁড়িয়ে সবাই হাত নেড়ে আমাদের বিদায় দিল। বেশ কিছুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এবার নৌকো একটা মোড় ফিরল, পাড়ের দৃশ্য আড়ালে চলে গেল। বিনাউটি গ্রামে আমারও ছুটি শেষ হল।

বিশেষ মন দিয়ে দেখছিলাম মাঝি কী করে লগি ফেলে, কত জোর দেয়, আর কিভাবে তা জল থেকে তোলে। বুঝলাম তার মধ্যে বেশ একটু কায়দা আছে; যেমন, সোজা যাবার জন্যে লগি একেবারে নৌকার গা ঘেঁষে ফেলতে হয়। এ কাজ করে-করে অবশ্য মাঝির হাত পেকে গেছে, তাই দেখে অত সোজা মনে হয়।

এবার এসে পৌঁছলাম সেই স্মরণীয় জায়গায়। নৌকোটা তখনো প্রায় জলে ডুবে রয়েছে। দিদিকেও দেখালাম, বললেন 'সেদিন কী কাণ্ডই না তুমি করেছিলে! কী যে হতে পারত!' দিদি এবার নিশ্চিন্ত হয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলেন। আমি একটু হেসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, নৌকোটা এখনো কেন ওখানে পড়ে রয়েছে। তিনি নির্লিপ্তভাবে জবাব দিলেন, 'উঃ, তারা এটা তুলে নেবেখন, সুবিধেমত। ওদের বলে দিয়েছি।'

দিদি বিনাউটিতে প্রথম আসেন বছর সাতেক আগে, বিয়ের পরে। তারপর থেকে বছরটা এ পথে আনাগোনা করেছেন। পুজোর সময় শ্বশুরবাড়িতে থাকা আর লক্ষ্মীপূর্ণিমার আগে নৌকো করে বাপের বাড়ি যাওয়া একটা বাৎসরিক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একাই যেতেন, এবার দৈবাৎ সঙ্গী জুটে গেল।

দিদি সুখে ছিলেন, কিন্তু সুখী ছিলেন না বোধহয়। কয়েক বছর আগে তাঁর একটি ছেলে হয়েছিল, জন্মাবার অল্প পরেই মারা যায়। তখন থেকে তিনি নিঃসন্তান। তা ছাড়া মানুষের সত্যিকার সুখের জন্য শুধু বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্যই যথেষ্ট নয়, মনের খোরাকেরও প্রয়োজন। এ দুয়ের সমন্বয় চিরদিনই কঠিন ছিল, তখনকার আমলে মেয়েদের বেলা তা ছিল একান্ত দুর্লভ, প্রায় স্বপ্নের মতো। তবু তাঁর মা-মাসিদের মতো তাঁরও জ্ঞানার্জনের আর বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। তখনকার দিনে তাঁদের পক্ষে স্কুলে যাওয়া সম্ভব ছিল না, তা ছাড়া তিন বোনেরই বিয়ে হল অল্প বয়সে। তা সত্ত্বেও নিছক নিজের চেষ্টায় বাড়িতে লেখাপড়া করে তাঁরা মানসিক উন্নতির পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁদের জীবনে স্কুল-কলেজের ডিগ্রির ছাপ ছিল না, কিন্তু আসল শিক্ষার ছাপ ছিল সুস্পষ্ট। আর তার সঙ্গে ছিল বহুল পরিমাণে কালিদাস যাকে বলে গেছেন 'নারীণাম্ অশিক্ষিতপটুত্বম্'। সেই সহজাত শিক্ষাহীন শিক্ষা তাঁদের ছিল বিশেষ সম্পদ।

দিদির বাল্যজীবনের ইতিহাসও ছিল একই ধরনের। তফাতের মধ্যে এই যে তিনি স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন আর মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল, কিন্তু ভাগ্য ছিল প্রতিকূল। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তাঁর বিয়ে হয় যখন তিনি স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে, বয়স তখন বোধ হয় চোদ্দ পেরোয় নি। তবু প্রগতিশীল পরিবারের আবহাওয়া, স্কুলে কয়েক বছরের শিক্ষা, বিবাহিত জীবনেও জ্ঞানার্জনের সাধ্যমতো চেষ্টা—সবকিছুর ফলে ডিগ্রিহীন হলেও তিনি ছিলেন মার্জিত, সুশিক্ষিত, চিন্তাশীল ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বপ্নপ্রবণ।

[ক্রমশ

বিষয় : ব্রহ্মদেশ

বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

(ক) ব্রহ্মরাজ্যের বিচারপ্রথা ও বিচারকক্ষ

কঠিন-কঠিন মোকদ্দমার কথা বলা এই ক্ষুদ্রায়তন রচনায় সম্ভবপর নহে। পূর্বতন মোকদ্দমার বিচারফল-গুলি যে গৃহে রক্ষিত ছিল, সে মহাফেজখানা নথিসহ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

গ্রামের ছোটো-ছোটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি মোকদ্দমা গ্রামের তুজির গৃহেই বিচারিত হইত। পকায়েত-প্রতিষ্ঠান ছিল না। কিন্তু গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ-গণ সম্মিলিত হইয়া মোকদ্দমা আপোসে নিষ্পত্তি করিতে সাহায্য করিতেন। তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত প্রায়ই ন্যায়সঙ্গত হইত।

তুজির বিচারালয়ে বাদী ও বিবাদী উভয়কেই দুই টাকা করিয়া বিচার-কর জমা দিতে হইত। তুজির কেরানি দু পক্ষ ও তাহাদিগের সাক্ষীদিগের জবানবন্দী লিখিয়া লইতেন। বাদী মোকদ্দমায় জয়লাভ করিলে শতকরা দশ টাকা হিসাবে রাজকর দাখিল করিয়া, বিচারের আদেশলিপি গ্রহণ করিত। উত্তর গান মুল্লুকে এখনো এইরূপ দশ টাকা কোর্ট ফী দেওয়ার নিয়ম আছে।

তুজি বা মিও-তুজির বিচারে অসন্তুষ্ট হইলে উন্-ডাউক বা মিও-উনের (গভর্নরের) নিকট আপীল করা যাইত। তুজির কেরানিকে রোজ আট আনা হিসাবে বারবরদারি দিলে, সে ঊর্ধ্ব-আদালতে যাইয়া আপীল দাখিল করিয়া দিত।

হ্লু-ড' ছিল ব্রহ্মরাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আদালত। দেওয়ানি, ফৌজদারি ও রাজস্বসংক্রান্ত সকল মোকদ্দমারই সেখানে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইত।

ফৌজদারি মোকদ্দমাতেও কার্যবিধি প্রায় এইরূপ ছিল। জরিমানাই ছিল সাধারণ দণ্ড। রাজদ্রোহিতা প্রভৃতি অসাধারণ অপরাধে কারাদণ্ড বা প্রাণদণ্ড হইত; কিন্তু মান্দালয়ের হ্লু-ড'র সম্মতি ভিন্ন কাহারও প্রাণদণ্ড করা যাইত না।

মান্দালয় শহরের বিচারকার্য অন্যান্য প্রদেশ হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ছিল।

স্বর্ণ বিচারালয় (shwe yon daw) নামে এখানে এক বড়ো আদালত ছিল। ইহাতে তুজি, মিও-তুজি, নে-ওক, দ্বীলা-বো, মিও-উক ও উন্ পিনের বিচারের আপীল গ্রহণ করা হইত। বিচার করিতেন মান্দালয়-মিও-উন্ (town governor)। কখনো-কখনো তিনি জুরি ডাকিয়া তাঁহাদের মত লইতেন। তাঁহাদের আদেশের আপীল হইত হ্লু-ড' কোর্টে।

দেওয়ানি, ফৌজদারি ও রেভেনিউ—তিন রকমের আদালত ছিল। কিন্তু পূর্বোক্ত স্বর্ণবিচারালয়ে সর্ব-প্রকারের মোকদ্দমাই গ্রহণ করা হইত।

রাজা তিব' কখনো-কখনো স্বীয় ইচ্ছা অনুসারে কোনো-কোনো মোকদ্দমা স্বয়ং বিচার করিতে পারিতেন। কিন্তু হ্লু-ড'র মন্ত্রিগণের স্বাক্ষর না পাইলে তাঁহার আদেশ কার্যে পরিণত করা যাইত না।

মহারানী থু পিয়ালার নিজের একটি কোর্ট ছিল—পশ্চিমদ্বারের সম্মুখে। তিনি সেখানে স্বর্ণ-পদ্ম আসনে বসিয়া স্ত্রীলোকদিগের ফরিয়াদ ও বিচার করিতেন।

আমাদের দেশের কাজির বিচারের ন্যায় প্রাদেশিক গভর্নরদের বিচারকার্যের আশ্চর্যজনক গল্প এখনো শোনা যায়। কোনো-কোনো বিচারক এরূপ কুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যে হ্লু-ড' সভা হইতে কঠিন-কঠিন মোকদ্দমার বিচারভার তাঁহাদিগের উপর অর্পিত হইত। কিন্তু সাধারণত গভর্নরগণই তাঁহাদিগের শাসনাধীন প্রদেশের শাসনকর্তা, বিচারকর্তা, রাজস্ব-সংগ্রহীতা, শান্তি-রক্ষক ও পূর্ত-স্থপতি-জলনালী-বিভাগের একমাত্র কর্তা ছিলেন। নানাপ্রকার কার্যে ব্যাপৃত থাকাতে বিচারকার্য কখনো-কখনো বিলম্বিত হইত।

বিচারকার্যের জন্য লিখিত কোনো আইন ছিল না। প্রাদেশিক রীতিনীতি, পুরাতন ধর্মতত্ত্ব ও মনুলিখিত সংহিতা তাহাদিগের পরিচালক (guide) ছিল। ইহাতে অবিচার হইত বলিয়া ব্রহ্মদেশীয়দিগের মুখে শোনা যায় না। ইংরেজি পুস্তকে লিখিত আছে—'উৎকোচগ্রহণে ব্রহ্মদেশের বিচারকার্য পঙ্গু হইয়া গিয়াছিল।'

হ্লু-ড'র বিচারপদ্ধতির কোনো লিখিত বিবরণ আমরা দিতে পারিলাম না। নানাপ্রকার গল্প হইতে একটি গল্প নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

অমরাপুরায় এক দোকানদার ছিল—নাম মংটিন্। তাহার স্ত্রী ছিল খুব সুন্দরী, নাম মা-ইউ।

অমরাপুরায় ভালো রেশমি কাপড় বয়ন করা হয়*। মংটিন দুই-তিন গাঁটরি রেশমি থান লইয়া মান্দালয়ে যাইত। দেখানে পাঁচ-সাত দিন থাকিত। থানগুলি বিক্রয় হইলে, মান্দালয় হইতে অন্য কোনো বাণিজ্য-দ্রব্য ক্রয় করিয়া অমরাপুরায় ফিরিয়া আসিত। মংটিনের অনুপস্থিতিতে মা-ইউ অমরাপুরার দোকানে বসিত, বিক্রয় করিত, হিসাব লিখিত ও ক্রেতাদিগকে মধুর বাক্যে আপ্যায়িত করিত। অবস্থা ভালোই ছিল।

অমরাপুরার মিও-উনের পুত্র মংহ্লাজ্য একদিন মা-ইউর দোকানে আসিলেন। এটা ওটা দেখিয়া দরদস্তুর করিয়া একখানি রেশমি গাউণ্ড-বাউণ্ড কিনিলেন, বলিয়া গেলেন—আমি তোমার দোকান হইতে আমার প্রয়োজনীয় জিনিস সব কিনিব।

মা-ইউ কৃতার্থ হইল। মিও-উনের পুত্র তাহার দোকানের ক্রেতা। ভবিষ্যতে খুব লাভের আশা করিয়া সে মংটিনকে এই সৌভাগ্যের সংবাদ জানাইল। মংহ্লাজ্য মাসে ২০০।২৫০ টাকার জিনিস নগদমূল্যে ক্রয় করিতে লাগিলেন।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে মা-ইউ ও মংহ্লাজ্যর ক্রেতা-বিক্রেতা সম্বন্ধ অন্যরকম হইয়া গেল। মংটিনের

* অমরাপুর রেশমের বয়নের বিশেষত্ব: বস্ত্র খুব খাপি হইবে, অথচ তাহার মধ্যে শিষের দিকে করিয়া পেন্সিল ঢুকাইয়া দিলে তাহা অপর দিকে বাহির হইবে। পরে আঙুল দিয়া বস্ত্র মসৃণ করিয়া দিলে পেন্সিলের ফুটো বেমালুম অন্তর্হিত হইবে। অ.মি.।

অনুপস্থিতিতে মহল্লাজ্য মা-ইউর গৃহে রাত্রিতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। চুনীর ইয়ারিং, হীরার অঙ্গুরীয়, সোনার হার প্রভৃতি বহুবিধ অলঙ্কারে মা-ইউর লাক্ষাপুটিকা পূর্ণ হইয়া গেল। মা-ইউ তখন খুব তানাখা মাখিত, সুন্দর প্রসাধন করিত, ভালো এঞ্জি ও কাপড় পরিত এবং দেড় ঘণ্টা ধরিয়া গা পরিষ্কার করিয়া স্নান করিত।

এদিকে মংটিনের মান্দালয়ের কারবারও ক্রমে বৃদ্ধিলাভ করিতেছিল। মাসের মধ্যে পনেরো দিনই তাহাকে কার্যানুরোধে মান্দালয়ে থাকিতে হইত। ঘরে যুবতী ভার্যা মা-ইউ, যুবক মহল্লাজ্যর সহিত যে অন্যায় সম্পর্ক পাতিয়াছিল তাহা মংটিন্ জানিত না, কোনো সন্দেহও করে নাই।

কয়েক মাস পর মান্দালয়ে যাতায়াতে কষ্ট ও অসুবিধা হওয়ায় মংটিন্ মান্দালয়ে তাহার এক এজেন্ট নিযুক্ত করিল। মা-ইউ এই প্রতিনিধি নিয়োগে সন্তুষ্ট হইল না। ব্যাবসার ক্ষতি নির্দেশ করিয়া মংটিনকে স্বয়ং মান্দালয়ে যাইয়া ব্যাবসা রক্ষা করিতে পরামর্শ দিল। কিন্তু মংটিন মা-ইউর কথা রাখিল না।

এইরূপ ব্যবস্থার পর মংটিন্ অমরাপুরাতেই থাকিতে লাগিল, মহল্লাজ্য সহিত মা-ইউর নৈশমিলন বন্ধ হইয়া গেল। মা-ইউ প্রণয়ীর অদর্শনে ক্রমে অস্থির হইয়া উঠিল। মহল্লাজ্যও ততোধিক অধীর হইয়া মা-ইউর নিকট দূতী পাঠাইয়া সংবাদ লইতে লাগিলেন। মাঝে-মাঝে তখন তাহাদের চোখের দেখা হইত, কিন্তু মিলন হইত না।

একদিন মা-ইউ স্বামী মংটিনকে বলিল—মাউঙ্, আমি এক বিলুর দয়ালাভ করিয়াছি; বিলু রাত্রি দুপ্রহরের সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে, এবং আমি যাহা চাই, তাহাই আমাকে দান করে। এতদিনে আমার দেবপূজা সার্থক হইয়াছে।

মা-ইউ মংটিনকে এক বহুমূল্য সোনার হার ও হীরার কুণ্ডল দেখাইল।

মংটিন্ সংবাদটি শুনিয়া খুশি হইল না। প্রেয়সী-ভার্যার উপর বিলুর দয়া তাহার মোটেই পছন্দ হইল না। সে বলিল, আমাকে দেখাও সে কীরকম বিলু।

মা ইউ বলিল, 'বেশ, আজই তোমাকে দেখাইব; তুমি দোকানঘরে থাকিও। সাবধান, আমার শোবার ঘরে তুমি আসিও না।'

রাত্রিতে মংটিন্ দেখিল, এক ভীষণাকৃতি পুরুষ, পরনে কালো কোট ও কালো পাজামা, মাথায় উজ্জ্বল রত্নমুকুট, পায়ে বৃহৎ, সুদীর্ঘ জুতা, আর হাতে খোলা তরোয়াল—রাত্রি বারোটার সময়ে সিড়ি দিয়া মা-ইউর শোবার ঘরে উঠিতেছে। মা ইউ দরজা খুলিয়া হাতজোড় করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। বিলু ঘরে প্রবেশ করিলে আবার দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

রাত্রি চারটা পর্যন্ত মংটিন্ বিমর্ষচিত্তে দোকান-ঘরে বসিয়া রহিল। তার পর বিলু ধীরে-ধীরে মা-ইউর শয়নঘর হইতে বাহির হইয়া মিও-উনের বাড়ির উদ্যানে অন্তর্ধান করিল।

এইরূপে প্রতি তিনদিন পরেই মংটিনের গৃহে বিলুর আবির্ভাব হইতে লাগিল। কোনো দিন বিলু আসিত সুন্দর সুবেশ ভদ্র মূর্তিতে, কোনো দিন ভয়ঙ্কর দৈত্যমূর্তিতে, আবার কোনো দিন আসিত মনোহারিণী "উর্বশী-মূর্তিতে"। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া মা-ইউ বিলুকে আরাধনা করিত। নানা প্রকার উৎকৃষ্ট ভোজ্য রন্ধন করিয়া তাহাকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইত, এবং ভোর চারটার সময়ে চা পান করাইয়া বিদায় দিত।

কিন্তু এই ভূতের অত্যাচার এক মাসের মধ্যেই মংটিনের অসহ্য হইয়া উঠিল। সে মা-ইউকে বলিল, সে ওঝা ডাকিবে।

মা-ইউ বলিল—অনর্থক একটা গোলমাল করিও না। বিলুর দয়ায় আমাদের ক্রমশই ধনবৃদ্ধি হইতেছে। এ সৌভাগ্য যার তার হয় না। তুমি অত্যন্ত পুণ্যবান বলিয়াই, এই অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন বিলুর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছ। নতুবা এতদিনে মংকোজির ব্যাবসার উন্নতিতে আমাদের দোকান উঠিয়া যাইত।

মংটিন্ আরও কিছুদিন বিলুর অত্যাচার নীরবে সহ্য করিল। তাহার পর একদিন রাত্রিতে গোপনে এক ওঝা আনিয়া দোকানঘরে বসাইয়া রাখিল। ওঝা দেখিয়া শুনিয়া বলিল: 'এ বিলু সাতলোকের রাজা; আমার সাধ্য নাই যে আমি কিছু সাহায্য করিতে পারি। তুমি অন্য ওঝা ডাকো।'

মংটিন আরও অধীর হইল; ব্যাবসায় তাহার মন রহিল না। মা-ইউ সোনা, চুনী, নীলা পাইয়া শতমুখে বিলুর প্রশংসা করিত, কিন্তু মংটিন সে চুনী-নীলায় সন্তুষ্ট হইল না। সে গোপনে এক জেরবাদী শিকারি সংগ্রহ করিল এবং একদিন রাত্রিতে এই জেরবাদীকে লইয়া বিলুকে হত্যা করিল।

মৃত্যুর পর মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, ওই নিশাচর বিলু অমরাপুরের মিও-উনের পুত্র হ্লাজ্য। জেরবাদী তখনই পলায়ন করিল। মংটিন পত্নীর বিশ্বাসঘাতকতায় আরও ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ মা-ইউর প্রাণসংহার করিল এবং তাহার পর মিও-উনের কেরানির নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা খুলিয়া বলিল।

মহল্লাজ্য ছিল মিও-উনের একমাত্র পুত্র। তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ মংটিনের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন, এবং তাহাকে কারাগারে বন্ধ রাখিয়া হ্ল্-ড'র সম্মতি প্রার্থনা করিলেন।

মংটিনের অপরাধসংক্রান্ত মোকদ্দমার কাগজ পৌঁছিলে, মহারাজ তিব এই মোকদ্দমার কথা মহারানী থুপয়ালাকে বলিলেন। মহারানী বলিলেন, বিচারের দিন আমিও উপস্থিত থাকিব।

বিচারের দিন মংটিনের পক্ষ হইতে উছান নামক এক উকিল হ্ল্-ড' সভায় হাজির হইলেন। তখনকার উকিলরাও সরকারি 'আদেশ' (আমেইন-ড') লইয়া আদালতে ওকালতি করিতেন। হ্ল্-ড' কোর্টের উকিলরা ফৌজদারি মোকদ্দমায় লাল চোগা পরিয়া কোর্টে হাজির হইতেন। বিচারক রাজমন্ত্রিগণ তাহা-দিগের বাদামি-চোগা ও চকোলেট টুপি পরিয়া পূর্ণ পদবীসঙ্গত পরিচ্ছদে বিচার করিতে বসিতেন। রাজা তিব' ছিলেন হ্ল্-ড' সভার সভাপতি। এ মহাসভায় মহারানীর কোনো বিচারাধিকার ছিল না। কিন্তু তথাপি তিনি প্রায়ই মহারাজ তিব'র পশ্চাতে বসিয়া তাহাকে বিচারকার্যে সাহায্য করিতেন।

মোকদ্দমার শুনানি আরম্ভ হইলে উকিল উছান মংটিনকৃত অপরাধের সমস্ত বিবরণ পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তৎপর অমরাপুরা-মিও-উনের আদেশপত্র পাঠ করা হইল। উছান বলিলেন:

—হ্লাজ্য যেরূপ চতুরতাপূর্বক আসামি জ্ঞা টিনকে প্রবঞ্চিত করিতেছিলেন, তাহাতে সরলস্বভাব জ্ঞা-টিন বুঝিতে পারে নাই যে মিওউনের পুত্র হ্লাজ্য বিলুর বেশ ধারণ করিয়া এইরূপ অপকার্য করিতে-ছিলেন। জ্ঞা টিন্ বিলুকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যেই তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। হ্লাজ্যকে হত্যা করিবার বাসনা তাহার ছিল না; হ্লাজ্য যে বিলুরূপ ধারণ করিয়াছে তাহাও সে জানিত না। সুতরাং জ্ঞা টিন্ ছদ্মবেশী মহল্লাজ্যর মৃত্যুর জন্য দণ্ডিত হইতে পারে না। তাহাকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ হউক।

হ্ল্-ড' কোর্টের বড়ো কেরানি মিও-উন মহাশয়ের আদেশপত্র সমর্থন করিয়া বলিলেন:

—বিলুগণ পরলোক হইতে ইহলোকে আসিয়া স্ত্রীলোকসহিত রাত্রিযাপন করিতে পারে, এরূপ কথা বিকৃতমস্তিষ্ক পাগল ভিন্ন অন্য লোকের বিশ্বাস হইবে না। জ্ঞা টিন্ পাগল নহে, সে সু-চতুর ব্যবসায়ী লোক; সে নিশ্চয়ই জানিত যে বিলুবেশী পুরুষ প্রকৃতপক্ষে বিলু নহে, রক্তমাংস-সম্পন্ন মানুষ। মহল্লাজ্য এই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল, জ্ঞা টিনের এরূপ জ্ঞান বা বিশ্বাস না থাকিলেও সে যে মানুষ হত্যা করিবার জন্য দা লইয়া বিলুবেশীকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয় না। সুতরাং জ্ঞা টিন্ নরহত্যা অপরাধে অপরাধী; প্রাণদণ্ডই তাহার উপযুক্ত

শাস্তি।

মহামন্ত্রী কিন্ উন্‌মিন্‌জী মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

—মংহ্লাজ্য পরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া মা-ইউর স্বামীর সম্মুখে যেরূপ পাপকার্য সম্পাদন করিতেছিল তাহাতে মা ইউর স্বামী পরদারাসক্ত পাপীকে হত্যা করিলেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে না; কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে এরূপ চরিত্রহীন ব্যক্তির প্রাণনাশ করিলে, মৃতব্যক্তির দেহের মূল্যস্বরূপ ৩২ টিকল রৌপ্য দিলেই হত্যাকারীকে মুক্তিদান করা যাইতে পারে।

মহামন্ত্রী খমপাট মিন্‌জী বলিলেন :

—মহারাজ, আপনার প্রজাগণ যদি দুষ্কৃতকারীদিগকে আদালতে অভিযুক্ত না করিয়া স্বহস্তেই তাহাদের প্রাণদণ্ড করিতে আরম্ভ করে, তবে রাজ্যে আইন বা আদালতের প্রয়োজন থাকিবে না। মংহ্লাজ্য পাপকার্য করিয়া থাকিলেও দণ্ডদানের কর্তা ব্রহ্মরাজ; তিনি তাহাকে দণ্ডিত করিতে পারিতেন। হ্লা টিন্ তাহাকে হত্যা করিয়া নরহত্যার অপরাধে দোষী হইয়াছে।

মহামন্ত্রী হ্লে তুইন্ উন্‌জী বলিলেন :

—স্বামীর সমক্ষে তাহার পত্নীতে উপগত হইলে স্বামীর স্বভাবতই ক্রোধ হইতে পারে। এবং এরূপ ক্রুদ্ধ অবস্থায় উপপতিকে হত্যা করিলে, হত্যাকারীকে দণ্ডদান করা সুবিচার নহে।

—পুরাকালে চিত্রকলির নরপতি এইরূপ এক অপরাধীকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন।

উকিল উছান কহিলেন :

—আমি নিবেদন করিতেছি যে, ব্রিটিশ আইন-মতেও এইরূপ অপরাধে শাস্তি হয় না। উপযুক্ত কারণে অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া জ্ঞানহীন অবস্থায় নরহত্যা করিলে হত্যাকারী ব্রিটিশ আইন অনুসারে অপরাধী নহে।

মহারাজ তিব' উকিলের কথা শুনিয়া বলিলেন :

—আমরা ব্রিটিশ আইন মতে হ্লা টিনের বিচার করিতে বসি নাই। আমাদের দেশের কানুন কী উকিল মহাশয় তাহা এই মহাসভাকে জানাইলে আমাদের বিচারকার্যে সহায়তা হইত।

উকিল উছান তখন পুনরায় নিবেদন করিলেন :

—মহারাজ, ব্রহ্মের কানুন আপনার অবিদিত নাই। তথাপি স্মরণার্থে আমি নিবেদন করিতেছি। মনুস্মৃতি ধর্মতত্ত্বের পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান মনু বলিয়াছেন :

হে মহারাজ, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বর্শা, তরবারি, তীর, বা অন্য কোনো অস্ত্র দ্বারা নিহত করিলে, তাহার প্রাণদণ্ড করা উচিত নহে। কারণ কোনো কুকুর যদি কোনো লোকের পায়ে দন্তাঘাত করে, মানুষের সেই কুকুরকে দন্তাঘাত করা উচিত নহে। রাজা হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড না করিলে, তিনি সকল দেবতা ও মানবের পূজ্য হন।

মহারাজ তিব' বলিলেন :

—প্রাণদণ্ড না হইলেও হত্যাকারীকে অন্য দণ্ড-প্রদানের ব্যবস্থা আছে। হ্লাজ্য অমরা মিঙ-উনের একমাত্র পুত্র। তাহাকে হত্যা করিয়া মংটিন্ তাহাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে।

উছান—মহারাজ, হ্লা টিন্ জ্ঞাতসারে হ্লাজ্যকে হত্যা করে নাই। সে জানিত সে বিলুকেই আক্রমণ করিয়াছে।

হ্লড'র কেরানি—মহারাজ, হ্লা টিন্‌কে স্ত্রীহত্যার জন্যও দণ্ডিত করা উচিত।

মহামন্ত্রী খামলট মিন্‌জী—স্ত্রীহত্যা মহাপাপ। এজন্য হ্লা টিনের প্রাণদণ্ড না হইলেও গুরুতর শাস্তি হওয়া উচিত।

মহারানী থুপিয়ালা—স্ত্রীহত্যার অপরাধে হ্লা টিন্‌কে কারাগারের বাহিরে সাধারণের সমক্ষে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত।

মহামন্ত্রী কিন উন মিন্‌জী বলিলেন :

—মহারাজ, ভগবান মনু সাত প্রকার স্ত্রী নির্দেশ করিয়াছেন। তাহা এই—১। জপনীর ন্যায় স্ত্রী, ২। ভগিনীর ন্যায় স্ত্রী, ৩। প্রভুর ন্যায় স্ত্রী, ৪। বন্ধুর ন্যায় স্ত্রী, ৫। শত্রুর ন্যায় স্ত্রী, ৬। দাসীর ন্যায় স্ত্রী, ৭। চোরের ন্যায় স্ত্রী। মা-ইউ যেপ্রকার ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাতে তাহাকে শত্রু স্ত্রীর মধ্যে পরিগণনা করা যাইতে পারে। তাহাকে বধ করিয়া হ্লা টিন্ দণ্ডভাক্ হইতে পারে না। ইহাই শাস্ত্রের বচন।

অন্যান্য মন্ত্রিগণ সকলেই মহামন্ত্রী কিন্‌উন্‌মিন্‌জীর মত সমর্থন করিলেন। মহারানী থুপিয়ালা হ্লা টিনের প্রাণদণ্ডের আদেশের জন্য মহারাজ তিব'কে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মহারাজ তি'ব মন্ত্রিগণের মতেই স্বীয় মত প্রদান করিয়া আদেশ দিলেন :

—হ্লা টিন্ বিলুবোধে হ্লাজ্যকে হত্যা করিয়াছে। মনুষ্যবোধে করে নাই। মা-ইউকেও সে গুরুতর অপরাধে নিহত করিয়াছে। স্বীয় পতির সম্মুখে দুশ্চরিত্রা পত্নী উপপতিকে ভজনা করিলে, পতি যদি ক্রোধান্ধ হইয়া উপপতিকে বা পত্নীকে বা উভয়কে হত্যা করে, তবে তাহাকে দণ্ডপ্রদান করা আমি ন্যায়সঙ্গত মনে করি না। হ্লা টিনের প্রাণদণ্ডাদেশ আমি কর্তন করিলাম। কিন্তু হ্লা টিনের বত্রিশ টিকল রৌপ্যমুদ্রা জরিমানা দিতে হইবে। সে টাকা অমরাপুরা মিঙ-উন পাইবেন।

বিচার সাঙ্গ করিয়া মহারাজ ও মহারানী হ্লুড' মহাসভা হইতে বহির্গত হইলেন।

উকিল উছানের সুনাম বাড়িয়া গেল।

[ক্রমশ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়, ১৯৪৫-৪৭

সুনীল সেন

চার

সেই বিষণ্ণ যুগে ঐক্যবদ্ধ ভারতের প্রতীক, ভবিষ্যতের আশা দক্ষিণ ভারত। এপ্রিলে পানজাব এবং উত্তর ভারতে দাঙ্গা অব্যাহত; বাঙলার তেভাগা-আন্দোলন মুমূর্ষু। শ্রমিক আন্দোলনের লাল দুর্গ বোম্বাই মার্চের শেষে দাঙ্গায় বিধ্বস্ত। শুধু বিহারে বকস্ত আন্দোলন দুর্বার—তবে সীমিত অঞ্চলে। দক্ষিণ ভারতে কিন্তু দাঙ্গার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি। শ্রমিক আন্দোলন নিস্তেজ হয় নি। তেলেঙ্গানায় চলছিল সশস্ত্র কৃষকবিদ্রোহ আর সেই সঙ্গে তেলুগুভাষীদের আত্মনিয়ন্ত্রণপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন। ত্রিবাঙ্কুরে ভোয়ালারে কারিগর এবং শ্রমিকদের এক অভ্যুত্থান। মালাবারে ভূস্বামী-প্রথার বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্ত আন্দোলন। এ যেন আর-এক ভারতবর্ষ! বাম-বিকল্পের সম্ভাবনা শুধু এই অঞ্চলে তখনো অবাস্তব বা অবান্তর হয় নি।

১৯৪৭ সালের শুরু মাদুরার কাপড়ের কলে ধর্মঘট দিয়ে। মিলের দরজা বন্ধ করে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণ হল; চারজন শ্রমিক মারা গেল।[১] ফেব্রুয়ারি মাসে কোয়েমবাটোরে আবার ধর্মঘট। ১১ মার্চ বাকিংহাম কর্ণাটক মিলে চোদ্দ হাজার মজুরের সর্বাত্মক ধর্মঘট।[২] ১৮ মার্চ 'মৌলিক দাবি দিবসে' আংশিক ধর্মঘট হল শিল্পাঞ্চলে[৩]। ৩১ মার্চ অসংখ্য কমিউনিস্টদের গ্রেফতার করে কংগ্রেস সরকার কমিউনিস্ট-বিরোধিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। এমনকী মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন নিষিদ্ধ হল। আন্দোলন দুর্বল হল বটে, তবু শ্রমিক ইউনিয়নে কমিউনিস্টদের প্রাধান্য ছিল অটুট। জুনের প্রথম সপ্তাহে বাকিংহাম-কর্ণাটক মিলের ধর্মঘটের মীমাংসা হয়। ক্ষমতা-হস্তান্তর পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলন সাধারণভাবে অব্যাহত ছিল।

ইতিমধ্যে তেলেঙ্গানায় শুরু হয়ে গিয়েছিল কৃষক-বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের পটভূমিকা জানা দরকার। প্রথম আন্দোলন শুরু করে অন্ধ্র মহাসভা (১৯৩০); এই প্রতিষ্ঠানের মৌল দাবি হায়দরাবাদে নিজামের শাসনের অবসান এবং অন্ধ্রজাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি। ১৯৪০-৪২ থেকে রবিনারায়ণ রেড্ডি এবং বাদাম ইয়াল্লা রেড্ডির নেতৃত্বে অন্ধ্র মহাসভার আংশিক সংগ্রাম পরিচালিত হয়। ১৯৪৬-এর শেষে শুরু হয় কৃষকসংগ্রাম। অবস্থার মৌল পরিবর্তন ঘটে স্বাধীনতার ঠিক পরে। নিজাম হায়দরাবাদের স্বাধীনতা ("আজাদ হায়দরাবাদ") ঘোষণা করেন। ইত্তেহাদ-উল-মুসলিমিন এবং কাসিম রাজভীর নেতৃত্বে পরিচালিত রাজাকার-বাহিনী দাক্ষিণাত্যে মুসলমান শাসন অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করে। কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টদের মোর্চা গঠিত হয়; তেরঙ্গা এবং লাল ঝাণ্ডার সমারোহ দেখা গেল গ্রাম-গ্রামান্তরে। সাহসের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি কৃষি-বিপ্লবের ডাক দিল। নিজামের শাসনের বিরুদ্ধে অন্ধ্র-জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলন এবং কৃষকবিদ্রোহের ধারা একস্রোতে মিলিত হল। সুন্দরাইয়া লিখেছেন: 'জাতীয় ভাবধারা ছিল আন্দোলনের পক্ষে,·· সমগ্র হিন্দু জনতা চাইছিল নিজামের সামন্ততন্ত্রী শাসনের অবসান···।[৪] কংগ্রেস নেতা রামানন্দ তীর্থ বন্দী হলেন, আর কমিউনিস্ট দল নিষিদ্ধ হয়েছিল ১৯৪৩-এ।

তেলেঙ্গানা আন্দোলনের দুটো স্তর চিহ্নিত করা যায়। প্রথম স্তর সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ পর্যন্ত; দ্বিতীয় স্তর জেনারেল চৌধুরীর হায়দরাবাদে অভিযান থেকে তেলেঙ্গানা সংগ্রামের সমাপ্তি পর্যন্ত। প্রথম স্তরের বৈশিষ্ট্য ব্যাপক কৃষক-জনতার যোগদান। এঁদের মধ্যে বিস্তর ধনী-কৃষক ছিলেন; নেতৃত্বের একটি অংশ ধনী-কৃষক। গ্রামীণ ঐক্য আন্দোলনের শক্তির উৎস। বড়ো-বড়ো ভূস্বামীদের জমি অধিকার এবং গ্রামের গরিবদের মধ্যে জমি-বণ্টন একমাত্র এখানেই হয়েছিল। জমির সর্বোচ্চ সীমা ছিল প্রথমে ৫০০ একর, পরে ১০০ একর। স্পষ্ট বোঝা যায়—ধনী-কৃষকদের সন্তুষ্ট রাখা ছিল নেতৃত্বের বাসনা। দ্বিতীয় স্তর সম্বন্ধে নেতৃত্বের মধ্যে তীব্র বিতর্ক রয়েছে। আন্দোলনের কিংবদন্তী নেতা রবিনারায়ণ রেড্ডির মতে, দ্বিতীয় স্তরে পার্টি হারায় হাজার-হাজার কর্মী; আন্দোলন ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের পঙ্কে নিমগ্ন হয়; কর্মীরা পুরানো এলাকা ছেড়ে আশ্রয় নেন সুদূর অরণ্যে।[৫] সুন্দরাইয়ার মতে, কোনো বিকল্প তখন ছিল না; প্রতিরোধ বিনা জেনারেল জে. এন. চৌধুরীর সশস্ত্র বাহিনী "লাল অঞ্চল" ধ্বংস করে দিত। প্রায় চার হাজার কর্মী নিহত হন; ষাট হাজার বন্দী হন। কে. এম. মুনসির হিসাব অনুসারে, দু-হাজার ভূস্বামী কমিউনিস্টদের হাতে নিহত হয়েছিল। ১৯৫১-র শরৎকালে আন্দোলন প্রত্যাহৃত হল। সুন্দরাইয়া লিখেছেন: এলাকার প্রধান কেন্দ্র লালগোণ্ডা, ওয়ারাঙ্গাল এবং খাম্মাম জেলাতেও কোনো গণ-আন্দোলন ছিল না। আক্রমণের লক্ষ্য ক্রমে-ক্রমে হয়েছিল ব্যক্তিবিশেষ। গণসংগ্রামের স্থান গ্রহণ করল ব্যক্তিহত্যা।[৬]

অবশ্য তেলেঙ্গানা আন্দোলনের বিজয় স্বীকার্য। নিজামের শাসনের অবসান হল। হায়দরাবাদ ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিল। হায়দরাবাদকে কেন্দ্র করে কোনো সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটে নি। শেষ পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হল হায়দরাবাদ। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তও ১৯৫২ সালে নতুন অন্ধ্ররাজ্যের সৃষ্টি। অন্ধ্রজাতির সংহতি সুপরিচিত। তেলেঙ্গানা অঞ্চলে কমিউনিস্টদের বিপুল প্রভাব অনেক বৎসর অক্ষুণ্ণ ছিল।

হায়দরাবাদের নিজামের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করেছিলেন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ান স্যর রামস্বামী আয়ার। জনসাধারণের শিক্ষার মান উন্নত হলেও এই রাজ্যে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা রাজা এবং দেওয়ানের হাতে কেন্দ্রীভূত রাখার এক পরিকল্পনা রামস্বামী পেশ করেন। কমিউনিস্ট পার্টি এই স্বৈরতন্ত্রী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে। পার্টির প্রধান ঘাঁটি ছিল পুন্নাপ্রা আর ভায়ালারে; পার্টির সমর্থক কারিগর, জেলে এবং কৃষিশ্রমিক। ১৯৪৬-এর অকটোবরে এক

অভ্যুত্থান দেখা গেল পুন্নাপ্রা-ভায়ালার অঞ্চলে। কমিউনিস্ট স্বেচ্ছাসেবকদের কেন্দ্র ভায়ালার—তাদের হাতে লাঠি, বল্লম, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র। সেনাবাহিনীর আক্রমণে প্রায় আট-শ কমিউনিস্ট বিদ্রোহী নিহত হন।[৭] নিঃসন্দেহে এক রক্তস্নান।

নাম্বুদিরিপাদ লিখেছেন, এই সংগ্রামমাত্র কয়েক দিনের মধ্যে পরাজিত হয়, কেননা এর পিছনে কৃষক ছিল না। কৃষক আন্দোলনের কেন্দ্র মালাবার—ত্রিবাঙ্কুর নয়।[৮] এই যুক্তি আংশিক সত্য। মনে রাখা দরকার, সেদিন মালাবারে তেভাগা কিংবা বকস্ত আন্দোলনের মতো কোনো জঙ্গি কৃষক আন্দোলন বিকশিত হয় নি; জেনমি-বিরোধী কয়েকটা বড়ো মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ত্রিবাঙ্কুরের আন্দোলন সাময়িকভাবে ধ্বংস হলেও, দেওয়ান-রাজের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত দিল। এক বছরের মধ্যে রামস্বামী আয়ারের পরাজয় হল যখন ত্রিবাঙ্কুর ভারতে যোগ দিল। পরবর্তী কালে ত্রিবাঙ্কুর আর মালাবার সংযুক্ত হয়ে কেরল রাজ্য গঠিত হয়েছিল রাজাগোপালাচারীর সাবধানবাণী উপেক্ষা করেই।[৯] ভারতে বাম বিকল্প প্রথম রূপায়িত হয়েছিল কেরলে কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা গঠনের মধ্য দিয়ে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্বে দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের সংগ্রামের গুরুত্ব অস্বীকার করলে ভুল হবে। হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, পাতিয়ালা, কাশ্মীর, ঢেনকানল ইত্যাদি দেশীয় রাজ্যে ত্রিশের দশকে যে আন্দোলন ছিল মন্থর, তা এক দুরন্ত বন্যায় পরিণত হয় ১৯৪৬-৪৭ সালে। দুঃখের বিষয়, এইসব আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণা এখনো আদৌ অগ্রসর হয় নি। তবু আমরা সংক্ষেপে এর প্রধান বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করব। ভারত বিভক্ত হলেও বেশির ভাগ দেশীয় রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এর পরিণতি ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন এবং স্বৈরতন্ত্রের অবসান।

পাঁচ

বর্তমান লেখকের প্রধান প্রতিপাদ্য এই যে, ১৯৪৫-৪৭ পর্বে বাম বিকল্প ঠিক দিবাস্বপ্ন ছিল না। অন্তত কয়েকটি অঞ্চলে এর রূপায়নের বাস্তব ভিত্তি ছিল। দক্ষিণ ভারতের কথা বলা হয়েছে। এই পর্বে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকসংগ্রামের বিষয় জানা দরকার। বিগত দুই দশকে বিষয়টি নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। বোধহয় বলা যায়—শ্রমিকদের তুলনায় কৃষক আধুনিক ঐতিহাসিকদের বেশি আকর্ষণ করেছে। এরিক স্টোকসের বিখ্যাত প্রবন্ধ The Return of the Peasant ("ইতিহাসের প্রাঙ্গণে কৃষকের প্রত্যাবর্তন") হয়তো অনেকের মনে পড়বে।[১০] ত্রিশের দশকে এক সর্বভারতীয় কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। নিঃসন্দেহে এর প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি হয়েছিল গান্ধীপর্বে—যার সূচনা চম্পারনে এবং খেদায়, এবং তার নেতা গান্ধী স্বয়ং। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে কৃষক আন্দোলন শান্ত নিস্তরঙ্গ ছিল। হঠাৎ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মতো কৃষকসংগ্রাম শুরু হল ১৯৪৬-এর ধানকাটার মরসুমে। প্রায় সারা ভারত জুড়ে কৃষক আন্দোলনের বিকাশ এই প্রথম দেখা গেল। নিখিল ভারত কৃষকসভার প্রতিবেদনে এই পর্বের কৃষকসংগ্রাম সম্বন্ধে বলা হয়েছে: 'unprecedented in sweep and intensity'।[১১] এই বক্তব্য আক্ষরিক অর্থে সঠিক।

আমরা শুধু কয়েকটি বড়ো সংগ্রামের কথা বলব। তেলেঙ্গানার কাহিনী ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এবারে বাঙলার তেভাগা আর টঙ্ক সংগ্রাম এবং বিহারের বকস্ত আন্দোলনের উপর দৃষ্টিপাত করা যাক। গোদাবরী পারুলেকর মহারাষ্ট্রের ওয়ার্লি কৃষকদের বিদ্রোহের বিবরণ দিয়েছেন। বর্তমান লেখকের মতে, ওয়ার্লিদের আন্দোলন মূলত ধর্মঘট সংগ্রাম; সীমাবদ্ধ অঞ্চলে ধর্মঘট কেন্দ্রীভূত ছিল। ধর্মঘট সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকশিত হল ওয়ার্লি উপজাতির চেতনা এবং সংগঠন।[১২]

নোয়াখালি দাঙ্গার এক মাস পরে দিনাজপুর জেলায় ঠাকুরগাঁও মহকুমায় তেভাগা সংগ্রামের শুরু; ডিসেম্বরের শেষে অবিভক্ত বাঙলার উনিশটা জেলায় সংগ্রাম প্রসারিত হয়েছিল। দাঙ্গার আগুন যেন দপ করে নিভে গেল। সংগ্রামের প্রধান কেন্দ্র মুসলমান-প্রধান কয়েকটি জেলা—দিনাজপুর, রংপুর, বোদা, পঢাগড়, দেবীগঞ্জ (জলপাইগুড়ি জেলা, অধুনা বাংলাদেশে), মৈমনসিংহ, খুলনা, যশোহর, চট্টগ্রাম। ইতিপূর্বে কোনো আন্দোলনে হাজার-হাজার মুসলমান কৃষক যোগদান করে নি। ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ দাবি মূল রণধ্বনি ("তেভাগা চাই") হলেও, কোনো-কোনো অঞ্চলে সংগ্রাম অর্থনীতিবাদের সীমানা ছাড়িয়ে বিপ্লবী রূপ নিয়েছিল। আইনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতায় সুরাবর্দি আন্দোলনের গতি বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন: '…আইনসঙ্গতভাবে আদালতের জারি করা পরোয়ানা সত্ত্বেও গ্রেপ্তার প্রতিরোধ করার এবং গ্রেপ্তার-হওয়া ব্যক্তিদের মুক্ত করার, দরকার হলে পুলিশকে আক্রমণ করার, মাঠ থেকে এবং কখনো-বা জোতদারদের বাড়ি থেকে জোর করে ধান নেবার নির্দেশ লোককে দেওয়া হয়েছে।…জমি চাষ করা হচ্ছে জোর করে…সংগঠিত করা হয়েছে সংগ্রাম কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, প্রচার ইস্তাহার, গোপন আশ্রয়স্থল। ব্যাজ আর লাঠি দেওয়া হয়েছে, স্বেচ্ছা-সেবকদের ড্রিল আর প্যারেড শেখানো হচ্ছে…।' খাঁপুর সংগ্রাম সম্বন্ধে তাঁর বিবৃতি এইরকম: 'ঢোল বাজিয়ে সংকেতধ্বনি করা হয়। আশেপাশের গ্রাম থেকে প্রচুর লোক এসে জড়ো হয় তীর-ধনুক, বর্শা ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র হাতে। তারা পুলিশের দলটিকে ঘিরে ফেলে। রাস্তার ঠিক মাঝখানে একটা গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছিল, ট্রাকটি পড়ে তার মধ্যে…।' ১২১ রাউনড গুলি ছোঁড়া হয়েছিল, ২০ জন নিহত হয়। তাদের মধ্যে দুজন কৃষক মহিলা আর দুজন স্থানীয় নেতা—চিয়ার কাই শেখ এবং হোগন মার্ডি। ডুয়ার্সে মাল ও মেটেলি অঞ্চলে দেখা গেল অভিনব দৃশ্য—চাবাগানের ওরাওঁ মজুর এবং গ্রামের ওরাওঁ কৃষকদের মিলিত অভিযান। রণজিৎ গুহ একে বলেছেন: 'ethnic solidarity'। সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং বীরসা মুণ্ডার আন্দোলনে এই ধরনের উপজাতীয় সংহতি দেখা গিয়েছিল। মৈমনসিংহের হাজং কৃষকদের টঙ্ক আন্দোলন সম্বন্ধে সুরাবর্দি বলেন: '…দুজন সশস্ত্র পুলিশকে বর্শাবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়…সুদূরতম গ্রামেও কমিউনিস্ট প্রচারপত্র পাওয়া গেছে। অনেক গ্রামে টঙ্ক ধানের বিরাট মজুত এবং বেশ কিছু বর্শা, লাঠি ও ধনুক পাওয়া গেছে।' হাজং উপজাতির ঐক্য টঙ্ক আন্দোলনে প্রতিভাত।[১৩]

মে মাস নাগাদ ঝড় থেমে গেল বটে, প্রধানত দাঙ্গার ধাক্কায়, কিন্তু গ্রামদেশ আর আগের মতো রইল না। যাঁরা আত্মগোপন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মধ্যশ্রেণীর নেতা ধরা পড়েন। স্বাধীনতার পর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মধ্যশ্রেণীর প্রায় সকল নেতা এবং কৃষক ক্যাডার নিজ-নিজ অঞ্চলে বীরের অভ্যর্থনা পেলেন। সরকার পাস করলেন পশ্চিমবঙ্গ বর্গাদার আইন, ১৯৫০। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তৈরি হল নতুন ক্যাডার, যাদের মধ্যে ছিলেন অসংখ্য মহিলা। তেভাগা আন্দোলনের এই ইতিবাচক ভূমিকা অবিস্মরণীয়। কৃষক আন্দোলনে এল দিক-পরিবর্তনের পর্ব; গ্রামের গরিবরা পুরোভাগে আসতে থাকেন।

বিহারে বকস্ত আন্দোলনের প্রথম তরঙ্গের কালপর্ব ১৯৩৬-৩৮; দ্বিতীয় তরঙ্গের শুরু ১৯৪৭-এর জানুয়ারিতে, যেটা চলেছিল স্বাধীনতার পরেও কয়েক মাস। প্রথম তরঙ্গের সময় কৃষকসভা ছিল সর্বদলীয় গণসংগঠন—তার পুরোভাগে স্বামী সহজানন্দ, এবং সচ্ছল কৃষকদের গোষ্ঠী। দ্বিতীয় তরঙ্গের সময় কৃষকসভা দ্বিধাবিভক্ত, কিন্তু সকল বামপন্থী দল আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। দ্বিতীয় তরঙ্গের কয়েক মাস আগে

পাটনা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত; আন্দোলনের স্রোতে দাঙ্গা বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে গেল। আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র গয়া, মুঙ্গের, সাহাবাদ জেলা। বকস্ত জমি থেকে উচ্ছেদ-প্রতিরোধ, এবং নিজেদের ফসল রক্ষাই ছিল কৃষকদের উদ্দেশ্য। বকস্ত জমিতে প্রজাদের কোনো স্বত্ব ছিল না। জমিদারি উচ্ছেদ আইন কংগ্রেস সরকার শেষ পর্যন্ত পাস করবে—এই আশঙ্কায় জমিদারদের চেষ্টা ছিল বকস্ত জমি থেকে প্রজা-উচ্ছেদ, নতুন প্রজা নিয়োগ, এবং জমিতে প্রজা যাতে স্বত্ব না পায়, তার ব্যবস্থা করা। কয়েকটি অঞ্চলে গরিব কৃষকরা বকস্ত জমি দখল করে; ভূমিহার পরিবারের মেয়েরা পরদাপ্রথা ভেঙে গঠন করেন "লাল ফৌজ"। পুলিসি বিবরণে আছে: মিছিলে যেসব মহিলা যোগ দেন, তাঁরা পুরোভাগে থাকেন বলে দমননীতির আশ্রয় নিলেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় মহিলাদের উপর অত্যাচারের কাহিনী। অতি পশ্চাৎপদ ভূস্বামীদের দুর্গ বিহারকে বকস্ত সংগ্রাম ১৯৩৬-৩৮ আর ১৯৪৬-৪৮ সালে একটা বড়ো ধাক্কা দিয়েছিল।[২৪]

কয়লাখনি অঞ্চলে ধর্মঘটের কথা আগে বলা হয়েছে। মার্চে পুলিস ধর্মঘটে সৈন্যদের গুলিবর্ষণে দুজন পুলিস নিহত হন। ছুটি আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল। ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের সম্মেলনে কৃষক, শ্রমিক এবং যুবসমাজের কাছে আপসের পথ পরিত্যাগ করে স্বাধীনতার জন্য "শেষ সংগ্রাম" সংগঠিত করার আবেদন করা হয়।[২৫] তখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ জয়প্রকাশ নারায়ণ। কিন্তু বামপন্থী ঐক্যের প্রশ্নে কোনো পরিষ্কার নির্দেশ ছিল না। এই পর্বে বামপন্থী ঐক্য সম্বন্ধে যিনি সোচ্চার ছিলেন তিনি মানবেন্দ্রনাথ। প্রথম যৌবনে কোমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যিনি লেনিনের সঙ্গে বিতর্কে যোগ দিয়ে গান্ধীবাদ এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের প্রবক্তা, তিনিই আবার ত্রিশের দশকে কংগ্রেসে যোগদান করে তাকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মঞ্চে পরিণত করার ভূমিকায় অবতীর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফ্যাসিস্টবিরোধী রূপ এই মহান বুদ্ধিজীবীর চোখে ধরা পড়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের অবসানে মানবেন্দ্রনাথ যেন ক্লান্ত, হতাশায় আচ্ছন্ন। তাঁর শেষ চেষ্টা বামপন্থী ঐক্য গঠন এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রগতিশীল ভাবধারার অবিরাম প্রচার। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান আসন্ন; সুতরাং সংগ্রামের লক্ষ্য হবে কংগ্রেস-পরিচালিত জাতীয় সরকার—যার সামাজিক ভিত্তি উচ্চবিত্ত শ্রেণী। মনে হয়, তখনো তাঁর মডেল ফরাসি বিপ্লব; গণবিপ্লবের ধাক্কায় সংবিধান পরিষদের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু কোনো বামপন্থী দল তাঁকে সমর্থন করল না। নিঃসঙ্গ, মোহমুক্ত মানবেন্দ্রনাথ আশ্রয় খুঁজলেন নতুন সমাজদর্শনে, যা র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম নামে অভিহিত।[২৬] বস্তুত, ১৯৪৬-৪৭ কালপর্বে বামপন্থী দলগুলি বিভ্রান্ত, আত্মকলহে নিমগ্ন, কোনো দীর্ঘমেয়াদি রণকৌশল উদ্ভাবনে অপারগ এবং ব্যর্থ। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল ১৯৪৮ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, এবং পরে ভেঙে যায়। জয়প্রকাশ নতুন আলোর সন্ধান পান বিনোবা ভাবের দর্শনে।

একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি "শেষ আঘাত হানো" প্রস্তাবে অবিচল আস্থা রেখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জঙ্গি কৃষকসংগ্রাম সংগঠিত করতে সচেষ্ট। সংগ্রামের প্রধান রূপ ছিল—উচ্ছেদ-প্রতিরোধ, ফসলে দেয় খাজনা (rent in kind)-এর পরিমাণ হ্রাস, এবং জমিতে স্বত্ব লাভ। সমাজতাত্ত্বিকরা বলতে পারবেন, সেদিন ঠিক কী কারণে ভারতে প্রায় সর্বত্র একই ধাঁচে কৃষকসংগ্রাম বিকশিত হয়েছিল। বর্তমান লেখকের ধারণা, মার্কস যাকে "প্রাক্-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা" বলেছেন, তার বিরুদ্ধে গরিব কৃষকদের সহজাত, স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন আন্দোলনের পুরোভাগে তাই দেখা গেল আদিবাসী এবং তপশিলি সম্প্রদায়ের কৃষকদের। উচ্চবর্ণের ধনী কৃষকদের ভূমিকা তেমন জঙ্গি ছিল না। অবশ্য তখনো তারা বিরোধী শিবিরে চলে যায় নি। মনে হয়, পুরনো গ্রামীণ ঐক্য তখন ভঙ্গুর।

আধুনিক গবেষণায় জানা গেছে, পূর্ব উত্তর-প্রদেশের কয়েকটি জেলায় "সির" (Sir) জমি থেকে উচ্ছেদ প্রতিরোধ করে জমির উপর দখল রাখছে প্রজাদের বাহিনী। ওড়িষায় কটক, পুরী এবং গঞ্জাম জেলায় বাঙলার তেভাগা আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত কৃষক "চুক্তিভাগ"প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে; পানজাবের ফিরোজপুর জেলায় বাতাইদার "তেভাগা"র দাবি উত্থাপন করেছে, আর পাতিয়ালায় গরিব কৃষক জমি দখল করছে। সর্বত্র আংশিক আন্দোলন ঠিকই, কিন্তু সর্বভারতীয় কৃষক আন্দোলনের বিকাশ এই প্রথম দেখা গেল।[২৭] ১৯৪৭-এর মে-জুন মাস থেকে দক্ষিণ ভারত ছাড়া অন্যত্র কৃষক আন্দোলনে ভাটার টান শুরু হল। তেলেঙ্গানা তখনো অপরাজিত।

কৃষক আন্দোলন সর্বভারতীয় রূপ নিয়েছিল, আর দেশীয় রাজ্যের আন্দোলন কয়েকটি রাজ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বিপুল শক্তিশালী হয়েছিল—যার মধ্যে নিহিত ছিল বাম বিকল্পের সম্ভাবনা। হায়দরাবাদ এবং ত্রিবাঙ্কুরে আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল কমিউনিস্ট-দের হাতে। কিন্তু কাশ্মীরে গণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন একজন জাতীয়তাবাদী যাঁর চিন্তায় ধর্ম-নিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ মিশে গিয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্বের প্রধান নায়কদের একজন শেখ আবদুল্লা, যাঁর জনপ্রিয়তা এবং ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। কাশ্মীরে কয়েক জন বামপন্থী থাকলেও, তাঁদের ভূমিকা ছিল গৌণ।

জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে ত্রিশের দশকে প্রজা-আন্দোলনের বিকাশ হলেও, ১৯৩৯ থেকে বিভিন্ন রাজ্যে একদল নতুন নেতা পুরোভাগে এসে-ছিলেন। এঁরা ছিলেন প্রধানত জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থক, কিন্তু যুবকদের মধ্যে প্রগতিশীল ভাবধারা ছড়িয়ে পড়েছিল। তেলেঙ্গানার রবিনারায়ণ রেড্ডি, ইয়ালা মথদুম মহীউদ্দিনের নাম এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লাকে পেশাদার কংগ্রেসি বলে চিহ্নিত করা যায় না—তাঁকে মনে হয় এক ব্যতিক্রম, গণ-আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে যাঁর উত্থান। ১৯৩৮-এ কাশ্মীরের "মুসলিম জাতীয় সম্মেলন"-এর তিনি নতুন নাম দিলেন—"জম্মু ও কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলন"। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক আদর্শে জাতীয় সম্মেলন অনুপ্রাণিত হল। সাম্প্রদায়িকতাবাদ এই অঞ্চলে প্রবল হতে পারে নি। ১৯৪৬ সালের গ্রীষ্ম-কালে "কাশ্মীরকো ছোড় দো" [কাশ্মীর ছাড়ো] সংগ্রামের শুরু। কৃষক থেকে মধ্যশ্রেণীর মানুষ সংগ্রামে শামিল হয়েছিল; বিভিন্ন মিছিলে সভায় পাঁচ থেকে পঁচিশ হাজার মানুষের যোগদান ছিল দৈনন্দিন ঘটনা। বেশির ভাগই মুসলমান। তাদের চোখে শের-ই-কাশ্মীর প্রধান নেতা।

কাশ্মীরের প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু রাজা নিজামের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কাশ্মীরের সার্বভৌমত্বের পতাকা উড্ডীন রাখেন, তার সঙ্গে চলে হিংস্র দমননীতি। শ্রীনগরের পথে-প্রান্তরে সৈন্য আর জনতার অসংখ্য সংঘর্ষ ঘটে; ২০শে মে শেখ আবদুল্লা বন্দী হন—তাঁর তিন বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ হল। নেহরু স্বয়ং কাশ্মীরে ছুটে যান—২০ জুন তাঁকেও বন্দী করা হয়।[২৮] সর্দার প্যাটের অবশ্য ওয়েভেলকে জানান—নেহরুর নীতি ঠিক কংগ্রেসের নীতি নয়। ইতি-মধ্যে শুরু হয়েছিল মহারাজার প্রধানমন্ত্রী কাকের সঙ্গে নিভৃত আলোচনা। কিন্তু বীর মহারাজা স্যর হরি সিং তখনো অটল, অবিচল। কিন্তু হায়, হঠাৎ পাকিস্তান থেকে দুরন্ত হানাদারদের অভিযান হল, আর এই লোকটি সঙ্গে-সঙ্গে সোনারুপোমণিমাণিক্য সহ দিল্লীতে আশ্রয় নিলেন এবং ভারতে কাশ্মীরের যোগদানের দলিলে স্বাক্ষর দিলেন (অকটোবর, ১৯৪৭)। ২ নভেমবর নেহরু কাশ্মীরে গণমত গ্রহণের প্রস্তাব ঘোষণা করলেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার,

"হানাদার"দের আক্রমণ প্রতিরোধ করার এবং ভারতের সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিলেন শেখ আদদুল্লা। তখন থেকে কাশ্মীর সমস্যার শুরু। কিন্তু প্রশ্ন হল : "কাশ্মীর ছাড়ো" আন্দোলনকে সেদিন সমর্থন করলে পরবর্তী ইতিহাস কি অন্যরূপ নিত না? ব্রিটিশ শাসকদের সৃষ্টি এক পরগাছা হিন্দু মহারাজার জন্য এত দরদ না দেখিয়ে "কাশ্মীর ছাড়ো" আন্দোলনের প্রতি নৈতিক সহানুভূতি দেখালেও উত্তর ভারতে মুসলমান জনমানসে তার ইতিবাচক ছায়া পড়ত।

কাশ্মীর পরিক্রমা করে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা রজনী পাম দত্ত প্রকাশ্য বিবৃতিতে কংগ্রেস নেতৃত্বকে অনুরোধ জানালেন কাশ্মীর সংগ্রামকে সমর্থন করার জন্য। তিনি লিখলেন :

The Princes are the lynchpin of the British Constitutional Plan. The entire structure is devised to play off the Congress and the League against each other in perpetual friction. ···Behind the scenes military and strategic plans are being hurried forward to build up the power of the States as the final basis of British Power.[২২] অবশ্য ব্রিটিশ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল। তাকে ব্যর্থ করার কৃতিত্ব প্রাপ্য গণ-আন্দোলনের। হায়দরাবাদ, কাশ্মীর, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের উত্তাল গণ-আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। এবার আমরা দৃষ্টি ফেরাব পাতিয়ালার দিকে। দেশীয় রাজ্য-গুলিকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে "লৌহমানব" প্যাটেল এবং ভি. পি. মেননের ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করার প্রবণতা ঐতিহাসিকদের লেখায় প্রকাশিত। অশান্ত জনগণের অবিরাম আন্দোলনের উল্লেখ প্রায় অনুপস্থিত অনেকের লেখায়।

পাতিয়ালা রাজ্যে একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষকসংগ্রাম চলছিল। ১৯২৮ সালে গঠিত "পানজাব রিয়াস্তি প্রজামণ্ডল" প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের দাবি তুলেছিল। ১৯৩০-এ প্রজামণ্ডল আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিল। নিষ্ঠুর দমননীতি পাতিয়ালার স্বৈরতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে ঘৃণা জাগাল। কৃষক আন্দোলন সৃষ্টির ওই ছিল পটভূমি।

কৃষকদের একটি বড়ো অংশ ছিল "মুজারা" (প্রজা)—এরা ফসলে খাজনা দিত (বাঙলার বর্গাদার-দের মতো)। কৃষকদের অধিকাংশই শিখ। "বিশ্বেদার" (জমিদার) বিপুল জমির মালিক এবং মহারাজার অবিচল সমর্থক। খাজনা বা "বাতাই"-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৩০ থেকে। প্রাথমিক পর্বে প্রজামণ্ডল একে সমর্থন করত। ১৯৪৬ সালে বাতাই-বন্ধের আন্দোলন এক অভ্যুত্থানের রূপ নিল। হাজার-হাজার মুজারার সভা অনুষ্ঠিত হল। অসংখ্য সংঘর্ষ চলেছিল বিশ্বেদার আর কৃষকদের মধ্যে। সংগ্রামের পুরোভাগে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি; পার্টির নেতা তেজা সিং স্বতন্ত্র—পুরনো "গদর" বিপ্লবী। কমিউনিস্টরা প্রজামণ্ডলের সঙ্গে সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে আগ্রহী ছিল। ১৯৪৭ সালের শুরুতে বাতাই-বন্ধ আন্দোলন জমি-দখল আন্দোলনে পরিণত হচ্ছিল—আন্দোলন প্রসারিত হয়েছিল ২২৮টি গ্রামে। মুজারারা দখল করেছিল এক লক্ষ বত্রিশ হাজার (১৩২০০০) বিঘা জমি। মুজারাদের প্রধান দাবি ছিল : বিশ্বেদারি-প্রথার অবসান; পুরনো ঋণ মকুব; পাতিয়ালা রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকারের প্রতিষ্ঠা এবং সার্বজনীন ভোট অধিকারের ভিত্তিতে অবাধ নির্বাচন।

স্বাধীনতার পরে প্রজামণ্ডল ক্রমশ জঙ্গি মনোভাব দেখাল—মহারাজার আংশিক সংস্কার প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি অগ্রাহ্য হল। মহারাজার শাসনযন্ত্র ব্যবহৃত হল মুজারাদের আন্দোলন ধ্বংসের কাজে। এই অবস্থায় ভি. পি. মেনন এবং সর্দার প্যাটেলের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ এবং পেপসু রাজ্য (পূর্ব পানজাব রাষ্ট্রের সংঘ) গঠন (জুলাই, ১৯৪৮); রাজ্যের প্রধান রাজপ্রমুখ পাতিয়ালার মহারাজা—তাঁর ভাতার পরিমাণ সতেরো লক্ষ টাকা। স্বৈরতন্ত্র এবং সামন্তদের সঙ্গে প্যাটেলের আপসমুখী মনোভাবের আর-একটা দৃষ্টান্ত।[২৩]

ওড়িষার ঢেনকানল আর নীলগিরি রাজ্য ১৯৩৮ থেকে প্রজামণ্ডলের শক্তিশালী কেন্দ্র। ১৯৪০-এ প্রজামণ্ডল কৃষকদের আন্দোলন পরিচালনা করে। ১৯৪৭-এ আন্দোলন বৈপ্লবিক রূপ নিল। মনে হয়, এর একটি কারণ ছিল তীরধনুকে সজ্জিত আদিবাসী কৃষকদের ব্যাপক যোগদান। স্বৈরতন্ত্রের অবসান দাবি করে প্রজামণ্ডল ঢেনকানলের রাজপ্রাসাদ অবরোধ করে; নীলগিরিতে আদিবাসী কৃষকরা জমি দখল করতে থাকে। সরকারের ধারণা হয় : এদের পরিচালনা করছে কমিউনিস্টরা। শেষ পর্যন্ত ঢেনকানল, নীল-গিরি এবং অন্যান্য রাজ্য ওড়িষার অন্তর্গত হয়।[২১]

ছয়

ইতিপূর্বে বলেছি, দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি অঞ্চল বাদে এই দেশে ১৯৪৭ সালের মে-জুন থেকে বাম বিকল্প মরীচিকা হয়ে গিয়েছিল। অসাধারণ ক্ষিপ্রতা এবং দক্ষতার সঙ্গে মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস, লীগ আর শিখ নেতাদের তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সম্মত করালেন। বিষয়টি ইতিমধ্যে বহু-আলোচিত; বিশেষ করে মসলে, গোপাল এবং মৌলানা আজাদের লেখা উল্লেখ্য। ১৪ জুন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (এ. আই. সি. সি.)-র অধিবেশনে গোবিন্দবল্লভ পন্থ দেশ-বিভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। আজাদ এবং পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধী পন্থ-প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তাঁর দুঃখ-বেদনা সম্পর্কে সন্দেহ করবার কারণ নেই। খান আবদুল গফফর খানের মনে হল—তাঁদের নেকড়ের মুখে ছুড়ে দেওয়া হল। পন্থ-প্রস্তাবের পক্ষে ১৫৭ আর বিপক্ষে মাত্র ২৯ ভোট পড়ে। কিছু পেশাদার রাজনীতিবিদ নিরপেক্ষ রইলেন। যে বিষয়টি মনে রাখা দরকার তা হল এই যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অঙ্কে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের একটি বড়ো অংশ ধর্ম-নিরপেক্ষতার আদর্শে আস্থা হারান নি। শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি-জীবীদের অনেকেই আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে গেলেন। উত্তরপ্রদেশ এবং পানজাবের রাজনৈতিক অবস্থার পার্থক্য চোখে পড়ে।

অধ্যাপক গোপাল ক্ষমতা-হস্তান্তরের দিনটিকে 'এক বিষণ্ণ প্রভাত' বলেছেন। রক্ষণশীল গোষ্ঠী সমাজের পুরোভাগে এল। ভি. পি. মেনন হলেন ওড়িষার অস্থায়ী গভর্নর। ইতিমধ্যে পানজাবের দাঙ্গার আগুন দিল্লীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রায় সাড়ে তিন কোটি মুসলমান তখনো ভারতে ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নে নেহরু-প্যাটেলের ভিন্নমত অজানা রইল না (আজাদ তাঁর বইয়ের সদ্যঃ-প্রকাশিত পরিমার্জিত সংস্করণে প্যাটেলের মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেছেন)। এত কালের নীরব গান্ধীবাদী রাজেন্দ্র প্রসাদ প্যাটেলের সমর্থক। ৩০ জানুয়ারি (১৯৪৮) দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জঙ্গি কর্মী নাথুরাম গডসের গুলিতে নিহত হলেন গান্ধীজী। নেহরুর আবেগময় বক্তৃতা কানে বাজে :

Friends and comrades, the light has gone out of our lives and there is darkness everywhere.[২২]

পানজাব আর দিল্লী তখনো জ্বলছে। অশান্ত ভারত। লক্ষ-লক্ষ মানুষ দেশ থেকে দেশান্তের চলমান। নতুন প্রজন্ম হতাশায় আচ্ছন্ন। পেশাদার রাজনীতিবিদ রঙিন কল্পনায় বিভোর। শুধু কিছু ব্রিটিশ আমলা আর দেশীয় রাজাদের প্যারাডাইস লস্ট।

বামপন্থীদের কেন্দ্র বাঙলার কথা একটু জানা দরকার। ১৯৪৫ সালে জেল থেকে মুক্তি লাভ করে কংগ্রেস নেতারা সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। গান্ধীবাদী খাদিগোষ্ঠীর নেতা ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ হন মুখ্যমন্ত্রী। "যুগান্তর" দল এঁদের পক্ষে। কংগ্রেস

সংগঠনের নেতৃত্ব ছিল সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের হাতে। অন্যান্য নেতাদের মধ্যে উল্লেখ্য "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের প্রথম সারির নেতারা—অজয় মুখোপাধ্যায়, ডা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন। দিগন্তে আর-এক নেতার নক্ষত্র তখন উদীয়মান। তিনি ডা. বিধানচন্দ্র রায়। ১৯৪৪ থেকে তিনি এবং কিরণশঙ্কর রায় গভর্নর কেসির কাছে "যুক্ত মন্ত্রিসভা" গঠনের সুপারিশ করেছিলেন। চল্লিশের দশকে মাড়োয়ারিদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।[১৩] তিনি হলেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী। গোপাল যথার্থই বলেছেন, ডা. রায় একজন 'প্রতিক্রিয়াশীল' রাজনীতিবিদ, অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে তুলনায় সর্বাপেক্ষা 'রক্ষণশীল'। নেহরুর আপত্তি সত্ত্বেও তিনি পশ্চিম বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টিকে হঠাৎ নিষিদ্ধ করলেন।[১৪]

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি "শেষ আঘাত হানো" প্রস্তাব থেকে সরে আসে। দেশে দাঙ্গার প্রসার এবং কংগ্রেস সংগঠনে দক্ষিণপন্থীদের প্রাধান্যের পটভূমিকায় নেহরু সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়। শ্রমিক এবং কৃষকদের আংশিক সংগ্রাম সংগঠিত করার বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ ছিল না। দাঙ্গা-প্রতিরোধ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। কিন্তু দ্বিতীয় কংগ্রেসে (মার্চ, ১৯৪৮) কমিউনিস্ট পার্টি নতুন রণনীতি (স্ট্র্যাটেজি) গ্রহণ করে। রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়: ভারতের 'আজাদি ঝুটা'; নেহরু সরকার ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল এক 'তাঁবেদার রাষ্ট্র'। পার্টির রণধ্বনি: 'তেলেঙ্গানার পথ আমাদের পথ'। পার্টির সাধারণ সম্পাদক হলেন বি. টি. রণদিভে; প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশী কেন্দ্রীয় কমিটিতেও নির্বাচিত হতে পারলেন না। ১৯৫১ সালের অকটোবরে দ্বিতীয় কংগ্রেস গৃহীত রণনীতি পরিত্যক্ত হল; পার্টি সংসদীয় পথ অনুসরণের সিদ্ধান্ত নিল।[১৫] কিন্তু ইতিমধ্যে (১৯৪৮-৫১) পার্টি হারাল শ্রেষ্ঠ কর্মীদের —শুধু তেলেঙ্গানায় নিহত হয়েছিলেন চার হাজার কর্মী। পশ্চিমবঙ্গে কাকদ্বীপ, হাওড়া, হুগলী আর মেদিনীপুরে, পূর্ব-পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশ) দিনাজপুর আর ময়মনসিংহে পার্টি হারাল কয়েক জন শ্রেষ্ঠ ক্যাডার। ক্যাডার একদিনে তৈরি হয় না—বুদ্ধিজীবীদের অনেক অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে ক্যাডার তৈরি হয়। ভারতে বাম বিকল্প (শুধু কেরল ব্যতিক্রম) যে সুদূরপরাহত হল, তা আদৌ দৈবাৎ ঘটনা নয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল, তা পূরণ করল হিন্দিভাষী অঞ্চলে জনসঙ্ঘ এবং তামিলনাড়ুতে ডি. এম. কে। বামপন্থী বিকল্পের সত্যিকার বিকল্প দেশে প্রতিষ্ঠিত হল।

বর্তমান লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝতে হলে গ্রামসির চিন্তা একটু জানা দরকার। অনেকের ধারণা, মার্কসবাদ সম্বন্ধে শেষ কথা বলেছেন লেনিন। আধুনিক গবেষণার আলোকে বলা চলে, মার্কসবাদী চিন্তাকে আরো উন্নত করার সম্ভাবনা শেষ হয় নি। লেনিনোত্তর যুগের সৃজনশীল মার্কসবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা গ্রামসি—মুসোলিনির কারাগারে যাঁর কেটেছিল এগারো বৎসর, এবং জেলেই যাঁর মৃত্যু। ইউরোপে ফাসিস্টতন্ত্র প্রথম বিজয়ী হয় ইতালিতে। জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের পরাজয়ের উপর মুসোলিনির বিজয়পতাকা উড্ডীন হয়। গ্রামসি তাই নতুন বৈপ্লবিক রণনীতির কথা বলেছেন যা নিষ্ক্রিয় বিপ্লব (প্যাসিভ রেভলিউশন বা ওয়র অব পজিশন) নামে অভিহিত।

বাস্তবকে অতিরঞ্জিত করে লাভ হয় না। বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় সশস্ত্র ক্ষমতা-দখলের রণনীতি ভ্রান্ত; তখন অনুসরণ করতে হয় নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের পথ—অসংখ্য মানুষের সমর্থন সংগ্রহের উপর যে পথের সাফল্য নির্ভর করে। নিম্নবর্গ (সাবঅল্টার্ন ক্লাসেস)-এর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উন্নত চিন্তা বিকশিত হয় না; উন্নত চিন্তার বাহন বুদ্ধিজীবী। দীর্ঘ দিনের সচেতন প্রয়াস বিনা সমাজে আদর্শগত নেতৃত্বের (হেগিমনি) প্রতিষ্ঠা দুঃসাধ্য। সমাজবিপ্লবের পূর্বশর্ত আদর্শগত নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা।[১৬]

মনে হয়, ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত গ্রামসির চিন্তা অনুসরণ করলে নেহরু পর্বে বাম বিকল্প এত ম্লান বিবর্ণ হত না, বিশেষত হিন্দিভাষী অঞ্চলে এবং মহারাষ্ট্রে।

তথ্যনির্দেশ

১. Madras Legistative Assembly Debates, ৫ম খণ্ড, এপ্রিল ১৯৪৭

২. ওই; হোম/পল, মাদ্রাজ, ন. ১৮.৩.৪৭

৩. হোম/পল, মাদ্রাজ, ন. ১৮.৩.৪৭ এবং ১৮.৬.৪৭ নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এই দিবসে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া সত্ত্বেও ভারতের আর কোনো শিল্পাঞ্চলে আংশিক ধর্মঘট হয় নি। মাদ্রাজে বিশাখাপত্তনম অঞ্চলেও ধর্মঘট প্রসারিত হয়েছিল।

৪. পি. সুন্দরাইয়া, Telangana People's Struggle, ১৯৭২, পৃ ৫৮।

৫. রবিনারায়ণ রেড্ডি, Heroic Telangana, ১৯৭৩

৬. পি. সুন্দরাইয়া, ওই, পৃ ৪২৩। আন্দোলনের নেতৃত্ব (সি রাজেশ্বর রাও, এম বাসবপুন্নাইয়া, এম. চন্দ্রশেখর রাও, পি. সুন্দরাইয়া, ভি. ভি রাও, রবিনারায়ণ রেড্ডি) আন্দোলন প্রত্যাহারের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

৭. কে. সি. জর্জ, Immortal Punnapra-Vayalar, ১৯৭৫

৮. ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ, A History of Indian Freedom Struggle, ১৯৮৬, পৃ ৮৮৩। মালাবার নিঃসন্দেহে কৃষক আন্দোলনের পুরনো কেন্দ্র, কিন্তু সেই সময় কোনো কৃষক অভ্যুত্থান মালাবারে ঘটে নি।

৯. এস. গোপাল, Jawaharlal Nehru, ২য় খণ্ড, ১৯৭৯, পৃ ২২৮। রাজাগোপালাচারির চিঠি—৩০ মে, ১৯৫২। তিনি লিখেছিলেন, কেরল রাজ্য গঠিত হলে সুবিধা হবে কমিউনিস্টদের। ধুরন্ধর রাজনীতিবিদের সতর্কবাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল। প্রথম কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল কেরলে।

১০. এই প্রবন্ধের জন্য দ্রষ্টব্য Eric Stokes, The Peasant and the Raj, ১৯৭৮।

১১. AIKS Papers, ১৯৩৬-৪৭, অজয় ভবন, নতুন দিল্লী।

১২. গোদাবরী পারুলেকর, Adivasis Revolt, ১৯৭৫। দুটি তালুকে আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল।

১৩. তেভাগা আন্দোলনে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য বর্তমান লেখকের হয়েছিল। তাঁর বই Agrarian Struggle in Bengal, 1946-47 প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। ভারতের বৃহত্তম কৃষক আন্দোলন তেভাগা অনেক গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কয়েকটি বই উল্লেখ্য: সুগত বসু, Agrarian Bengal, ১৯৮৮; ডি. এন. ধানাগার Peasant Movements in India, ১৯৮২; আন্দ্রিয়েন কুপার (লন্ডন), অশোক মজুমদার (দিল্লী), দীপঙ্কর ভট্টাচার্য (রবীন্দ্রভারতী), রবীন মণ্ডল (রবীন্দ্রভারতী)-এর অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. থিসিস। যুদ্ধোত্তর যুগের কৃষক আন্দোলনের বিশ্লেষণ করেছেন বিপানচন্দ্র এবং অন্যান্য, India's Struggle for Freedom, 1988, পৃ ৩৫২-৫৫

১৪. দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, Peasant Movements in Bengal & Bihar, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. থিসিস। এবং হোম/পল, বিহার, ১৮.৬.১৯৪৭

১৫. "সার্চলাইট", ১০.২.১৯৪৭। লাহোরে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বিপ্লবের আহ্বান জানান, হোম/পল, পানজাব, ১৮.৭.১৯৩৬

১৬. সৌরেন গাঙ্গুলী, M. N. Roy and Indian Politics, 1920-48, ১৯৮৪, পৃ ২৭৫-৮০

১৭. Report of AIKS, 1947, AIKS Papers, অজয় ভবন, নতুন দিল্লী। পানজাবের আন্দোলনের জন্য দ্রষ্টব্য মাস্টার হরি সিং, Punjab Peasant in Freedom Struggle, ২য় খণ্ড, ১৯৭৪, পৃ ২৪৮-৪৯

১৮. Peoples Age, 26 May, 1946 এবং 2 June, 1946

১৯. ওই, 30 June, 1946

২০. মৃদুলা মুখার্জির চমৎকার প্রবন্ধ Peasant Movement in Patiala State, 1937-48, ১৯৭৯ দ্রষ্টব্য। আকালি নেতা মাস্টার তারা সিং সাধারণভাবে পাতিয়ালার মহারাজাকে সমর্থন করতেন। কমিউনিস্টরা নমনীয় কৌশল অনুসরণ করে প্রজামণ্ডলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। ওড়িষার প্রজা আন্দোলনের বিবরণ (১৯৮-৪৬) দিয়েছেন সুরেন্দ্র দ্বিবেদী, Quest for Socialism, ১৯৮৪, পৃ ৭-৮০। কৃষকদের সংগঠিত

করতে গ্রামে গ্রামে পত্রিকা করেছিলেন মালতী চৌধুরী, নবকৃষ্ণ চৌধুরী প্রভৃতি। পাতিয়ালার জঙ্গি কৃষক আন্দোলনের জন্য দ্রষ্টব্য People's Age, 16 February, 1947। রাজনৈতিক ভূমিকার জন্য অবশ্যপাঠ্য V.P. Menon, The Story of the Integration of Indian States.

২১. ভি. পি. মেনন, ওই, পৃ ১৪৬-৪৮। দ্বিবেদী, ওই, পৃ ৭২।

২২. গোপাল, ওই, পৃ ২৪, ২৫, ৩৬।

২৩. Personal Diary of R. G. Casey, ইনডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ৭ নভেম্বর, ১৯৪৪ এবং ৭ জুন, ১৯৪৫। বিবদমান রাজনৈতিক দল-উপদলসম্পর্কে কেসি লিখেছেন, 'গোঁড়া কংগ্রেস বনাম বোম্বে দল; হিন্দু মহাসভা বনাম কংগ্রেস; ফজলুল হকের মুসলমান বনাম মুসলিম লীগ। মাড়োয়ারিদের সঙ্গে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের যোগাযোগ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য B. R. Tomlinoon, The Indian National Congress and the Raj, ১৯৭৬, পৃ ৪২।

২৪. গোপাল, ওই ৭২। রায়কে নেহরুর চিঠি, ১৩ মে, ১৯৬৭। নেহরু লিখেছিলেন : It is a slippery slope...pure repression will fail।

২৫. M. B. Rao, ed., Documents of the History of the Communist Party of India, 1948-50, ৭ম খণ্ড, ১৯৭৬। ২য় পার্টি কংগ্রেসে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে বর্তমান লেগকের ধারণা—'সংস্কারবাদের নায়ক' হিসাবে শুধু পি. সি. যোশীকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য নেতাদের এবং প্রাদেশিক নেতাদের ভূমিকার আলোচনা হয় নি।

২৬. Q. Hoare and G. N. Smith, ed. A Gramsci, Selections from Prison Notebooks, 1971। বর্তমান লেগকের প্রবন্ধ Thought of Gramsci, Agrarian Question, Revolutionary Strategy and Contemporary India, Socialist Perspective দ্রষ্টব্য।

সমাপ্ত

ইতিহাসের বিকাশ প্রসঙ্গে মার্কসীয় প্রত্যয়ের বিচার

অজিত রায়

বিগত তিন দশকে, অর্থাৎ স্তালিনের মৃত্যুর পর থেকে, সারা দুনিয়ায়, বিশেষ করে পশ্চিমী দেশগুলির মার্কসবাদী মহলে নতুন করে তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার ঢেউ দেখা যায়। আগে যা সবটাই আপ্তবাক্য হিসেবে ধরা হত, তার পরিবর্তে মার্কসের নিজের কোনো-কোনো তত্ত্ব বা ব্যাখ্যাকেও মার্কসবাদী মহলে প্রশ্ন করা শুরু হয়। বাঙলা ভাষায় এইসব বিতর্কের পূর্ণ বিবরণ তো দূরের কথা, এর উল্লেখও বেশি দেখা যায় না। মার্কসপন্থী চিন্তাবিদ অশোক রুদ্র তাঁর এই সাম্প্রতিক পুস্তকে বাঙালি পাঠককে এইসব বিতর্কের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ের সুযোগ করে দিয়েছেন।

প্রয়াত সমর সেনের স্মৃতির প্রতি উৎসর্গীকৃত এই পুস্তকের দুই ভাগে লেখকের বিভিন্ন সময়ে ও উপলক্ষে রচিত মোট নয়টি নিবন্ধ একত্র করা হয়েছে। বিষয়-গুলি হচ্ছে, প্রথম ভাগে অর্থাৎ সামগ্রিক ক্ষেত্রে : (১) সমাজবিজ্ঞানে বিষয়গততা, (২) ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসের মতামতের কয়েকটি দফা, এবং (৩) ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সমস্যা; দ্বিতীয় ভাগে, তথা, ভারতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে: (৪) সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে, (৫) ঊনবিংশ শতাব্দীর পুনর্মূল্যায়ন, (৬) স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ ও স্থানীয় ক্ষমতা, (৭) ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে শ্রেণী-কাঠামো, (৮) ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে ভাগ-বিভাগ, এবং (৯) ভারতে (অর্থনৈতিক) পরিকল্পনা-মূল্যায়ন। কখন এবং কোন্ উপলক্ষে নিবন্ধগুলি রচিত, তার কোনো উল্লেখ নেই।

প্রথম সমস্যা নামকরণ নিয়ে। লেখকের নামকরণ থেকে মনে হয়—যেন দ্বিবিধ চরিত্রের মার্কসবাদ প্রাপ্তব্য—ইউরোপ-কেন্দ্রিক ও অন্যবিধ। তাঁর প্রকৃত মনোভাব কিন্তু তা নয়। ভূমিকায় তিনি সঠিকভাবেই বলেছেন যে, পশ্চিম ইউরোপে ধনতন্ত্রের উদ্ভবের যে ঐতিহাসিক রূপরেখা মার্কস এঁকেছেন, তাকে বিশ্ব-জগতের অনন্ত বিকাশপন্থা বলে চালাবার চেষ্টা তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলেই মার্কস মনে করতেন; তা ছাড়া, ইউরোপের বাইরে, বিশেষ করে ভারত আর চীনের ক্ষেত্রে, তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নির্ণয়-প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মার্কস তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকট করে গিয়েছেন। সুতরাং ভারতীয় ইতিহাসের নিজস্ব গতিধারা সন্ধানের প্রয়োজনীয়তা, এবং তার সাফল্যের পূর্বশর্ত হিসেবে ইউরোকেন্দ্রিক বিশ্বজনীন বিকাশ-পথের 'ডাণ্ডাবেড়ি' পরিহার অবশ্যকর্তব্য। অশোক রুদ্রের এই মত নিয়ে মার্কসবাদী মহলে বিতর্ক থাকা উচিত নয়।

এরই সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পুস্তকের ভূমিকায় লেখকের দ্বিতীয় মন্তব্য যে, ইতিহাসের অমোঘ বিধান বলে কিছু নেই। মার্কসবাদকে যাঁরা কঠোর নিয়তিবাদের পর্যায়ভুক্ত করেন, তাঁরা মার্কসীয় চিন্তা তথা কর্মধারার পরিপন্থী। রুদ্রের এই বক্তব্যও বহুজনগ্রাহ্য মার্কসীয় সিদ্ধান্ত। কিন্তু একদিকে এই অভিমত প্রকাশ করলেও লেখক এর তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন বলে মনে হয় না। তাঁর দ্বিতীয় নিবন্ধে, অর্থাৎ, ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসের মতামত আলোচনা করতে গিয়ে, পাদটীকায় কিছুটা সংশয় ব্যক্ত করা সত্ত্বেও তিনি নানাবিধ গাণিতিক সমীকরণ মারফত ভবিষ্যৎ নির্ধারণের যে সীমিত সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন, তা

Non-Eurocentric Marxism and Indian Society. Ashok Rudra. People's Book Society. Cal. 73, 1988. Rs. 75

কিন্তু মার্কসের মতামতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ কথার অর্থ এই নয় যে, মার্কস কখনও ভবিষ্যদ্বাণী করেন নি। তিনি বহুক্ষেত্রেই অদূর এবং সুদূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানাবিধ উক্তি করেছেন। কিন্তু সেসব উক্তিকে ভবিষ্যদ্বাণী বলা যায় না, কেননা কোনো ক্ষেত্রেই তা মানুষের সামাজিক-কর্মকাণ্ড-নিরপেক্ষ নিয়তি বলে উপস্থাপিত হয় নি। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্যের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে মানুষের সম্ভাব্য সক্রিয় ভূমিকা। কিন্তু মানুষের সেই সক্রিয় ভূমিকা এতবেশি ধরনের ছোটো-বড়ো কারণ-কারকের উপরে নির্ভরশীল যে, সে সম্পর্কে পূর্বাহ্নে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়; এবং গাণিতিক সমীকরণের মারফত তার পূর্বাভাস দেওয়া যায় না।

অশোক রুদ্র সামন্ততন্ত্রের প্রত্যয় এবং ভারতে সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব আর উপস্থিতি সম্পর্কে মার্কসবাদী মহলে যেসব প্রশ্ন এবং বিতর্ক আছে, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে রুদ্রের মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, ভারতে সঠিকভাবে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয় নি। ব্রাহ্মণ্যধর্ম, জাতিভেদ এবং তৎসংশ্লিষ্ট কর্মফলবাদ ইত্যাদি ভাবাদর্শগত প্রভাব খাটিয়ে এদেশের উচ্চবিত্ত সমাজ শ্রমজীবী জনসাধারণকে বশে রেখেছে; এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে তাদের সঠিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মতো বলপ্রয়োগ করতে হয় নি। এই বিতর্কের মূল্যায়ন করার, এমনকী বিস্তৃত আলোচনার সুযোগও এখানে অনুপস্থিত। তা ছাড়া, রুদ্রের বক্তব্যপ্রসঙ্গে তা অপরিহার্যও নয়। কেননা, তাঁর মূল বক্তব্য হচ্ছে—সামাজিক বিবর্তনের আলোচনায় মার্কসীয় উৎপাদনপদ্ধতি (মোড অব প্রোডাকশন)—এই প্রত্যয়েরই কোনো অপরিহার্যতা নেই। তাঁর এই মত অনুসারে, ভারতের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত সমাজবিন্যাস আলোচনা করতে গিয়ে—অশোক রুদ্র যে দুটি অভিনব প্রত্যয়ের জন্ম দিয়েছেন, তা হল: (১) স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ এবং (২) সামাজিক শক্তি (সোশ্যাল পাওয়ার)।

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজের তিনি সংজ্ঞা দিয়েছেন: অধিকাংশ গ্রামবাসী, যাঁরা প্রধানত শ্রমশক্তি-বিক্রেতা অথবা স্বয়ং-নিযুক্ত উৎপাদক, অবস্থার চাপে পড়ে তাঁদের আর্থনীতিক লেনদেন সীমিত রাখতে বাধ্য হন নিজ-নিজ গ্রামের অধিবাসী, স্বল্পসংখ্যক বিত্তশালী লোকের সঙ্গে।

এই বিত্তশালী অংশ যে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে নানা ধরনের আর্থনীতিক গাঁটছড়ায় বাঁধা, তা কিন্তু রুদ্র অস্বীকার করেন নি। সুতরাং অন্য সবদিক উপেক্ষা করলেও রুদ্রর নিজের দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ীও গ্রামীণ সমাজ মোটেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

সম্পদ ও আয়ের [বৈষম্যমূলক ভাগবাঁটোয়ারা, বর্ণভিত্তিক কাঠামো, পেশাগত নকশা, এবং প্রথা ও প্রচলিত নিষেধ (ট্যাবু)] ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক উপাদান থেকে উদ্ভূত শক্তিকেই রুদ্র গ্রামীণ স্তরের সামাজিক শক্তি বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, এই ধরনের বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ সমাজ অনেক ক্ষেত্রেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে। অর্থাৎ, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং এক ধরনের জাতীয় অর্থনীতির অন্তরভুক্ত হচ্ছে।

রুদ্রর মনে রাখা উচিত যে, এই আর্থনীতিক সমাকলনের চাইতে আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রাজনৈতিক সমাকলন, যা প্রতিনিয়ত ঘটছে এবং উত্তরোত্তর গভীরতর হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার বাহন হচ্ছে থানা-পুলিশ, আইন-আদালত, পঞ্চায়েত, বিধানসভা, সংসদীয় নির্বাচন, শিক্ষা, বেতার ও দূরদর্শন ইত্যাদি। এই রাজনৈতিক শক্তি শুধু জাতীয় ক্ষেত্রেই পরিব্যাপ্ত নয়—অর্থনৈতিক, কৃষ্টিনৈতিক এবং রাজনৈতিক সূত্রে তা দেশের সীমান্তর বাইরে বহুবিধ আন্তর্জাতিক শক্তিবিন্যাসের সঙ্গে যুক্ত। এইসব থেকে এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই ভ্রান্ত হবে না যে, ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং গ্রামভিত্তিকশক্তিশাসিত বলে বিবেচনা করলে এই সমাজের বর্তমান চলমানতাকে

অস্বীকার, এবং এই চলমানতার চরিত্র এবং গতিমুখ নির্ধারণের কর্তব্য উপেক্ষা করা হয়। এই প্রসঙ্গেই মার্কসের নির্ণীত উৎপাদনপদ্ধতির চরিত্র নির্ধারণের তাৎপর্য বোধগম্য হওয়া উচিত।

মার্কস তাঁর সামগ্রিক চিন্তার কেন্দ্রস্থলে যে প্রশ্নটি উপস্থাপিত করেছেন, তা হচ্ছে বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন সামাজিক গঠনের মধ্য দিয়ে মুক্তির পথে মানুষের অভিযান। এই যাত্রাপথে উত্তরণের সোপান হিসেবে এসেছে উৎপাদনপদ্ধতির প্রত্যয়। মার্কসের ভাষায়:

'[যে যুগে শ্রমজীবী নিজেই বাস্তব উৎপাদনের কারণাংশ (conditions of production), সেই ক্রীতদাসত্বের যুগ বাদ দিলে] শ্রমজীবী ও উৎপাদন-কারণাংশের আদিম ঐক্য দুটি প্রধান রূপ নিয়েছে: এশীয় সামুদায়িক (communal) ব্যবস্থা (আদিম সাম্যবাদ) এবং পরিবারভিত্তিক ক্ষুদ্রায়তন (এবং গার্হস্থ্য শিল্পের সঙ্গে যুক্ত) শিল্প। এ দুটিই ভ্রূণরূপ আকার এবং এই উভয় আকারই শ্রমকে সামাজিক শ্রমরূপে বিকাশের এবং সামাজিক শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের পক্ষে অনুপযুক্ত। এইজন্য প্রয়োজন হয় শ্রম এবং সম্পত্তির (অর্থাৎ উৎপাদনের কারণাংশের উপর অধিকার) মধ্যে বিচ্ছেদ, বৈষম্য। এই বিচ্ছেদের সর্বাপেক্ষা চরম রূপ—যার মধ্য দিয়ে সামাজিক শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি সর্বাপেক্ষা প্রবলভাবে বিকশিত হয়, তা হচ্ছে মূলধন। মূলধন যে বাস্তব ভিত্তি রচনা করে, একমাত্র তার উপরেই এবং সেই রচনাপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণী এবং সমগ্র সমাজ বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া অতিক্রম করে; এর মাধ্যমেই (উৎপাদনের কারণাংশ ও শ্রমের) আদিম ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে।' (কার্ল মার্কস, থিয়োরিজ অব সারপ্লাস ভ্যালু, ৩য় খণ্ড, মস্কো, পৃ ৪২২-২৩, গুরুত্ব আরোপ মার্কসের)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আদিম সমাজ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এই ঐতিহাসিক উত্তরণের বিভিন্ন পর্যায়ের নিজস্ব গতিধারা উপলব্ধির জন্য উৎপাদনপদ্ধতির চরিত্র-নির্ণয়ের আবশ্যকতা রয়েছে। রুদ্রের প্রস্তাবিত বিকল্প এই দায়িত্ব পালনে অক্ষম।

বিষয়টা আরেকটু বিস্তারিত করে আলোচনা করা যায়। মার্কসীয় উৎপাদনপদ্ধতির ক্রমবিবর্তনের মূল সূত্র হচ্ছে শ্রমজীবীর স্বাধীন সত্তার ক্রমবিকাশ। দাসপ্রথায় যে পুরোপুরি মালিকের সম্পত্তি, সামন্ততন্ত্রে যে অর্ধস্বাধীন, ধনতন্ত্রে তার পূর্ণ স্বাধীনতা, কিন্তু তা নিছকই আনুষ্ঠানিক বা বাহ্যিক; আসলে সে মজুরির দাস। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই তার আনুষ্ঠানিক এবং বাস্তব স্বাধীনতার একীকরণ সম্ভব হয়। এই পর্যায়ক্রমের ধারণাই শ্রমিকশ্রেণীকে তার শ্রেণীসংগ্রামের লক্ষ্য স্থির করতে সাহায্য করে। তাই উৎপাদনপদ্ধতির প্রত্যয় ছাড়া এই ঐতিহাসিক অভিযানের দিগ্দর্শন সম্ভবপর নয়।

পরিশেষে লেখকের অন্তত দুটি গুরুতর ত্রুটির উল্লেখ প্রয়োজন। ৪৪ পৃষ্ঠায় রুদ্র বলেছেন—ইউরোপে ধনতন্ত্র প্রসারের স্বার্থে আদিম সঞ্চয়ের জন্যে সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের প্রয়োজন হয়েছিল। এক্ষেত্রে তিনি সমান্তরাল দুটি পৃথক ধারাকে একাকার করে ফেলেছেন। মার্কস আদিম সঞ্চয় বলতে শুধু "উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদকের" মধ্যে বিচ্ছেদকেই বুঝিয়েছেন। সাম্রাজ্য-বিস্তার, লুঠপাট ও বলপূর্বক ধনসম্পদ আহরণকে তিনি আদিম সঞ্চয়ের প্রেরণা বলে উল্লেখ করেছেন। (ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, ২৬ ও ৩৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

আরেক জায়গায় (পৃ ১১২) রুদ্র শ্রমশক্তির পরিবর্তে শ্রমিক ও শ্রমকে পণ্য বলে গণ্য করেছেন। শেষ কথা, অশোক রুদ্রের আংশিক রচনাসংগ্রহও চিন্তার উদ্রেক করে বলে মূল্যবান।

মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাসের পাঠক্রম—পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি

খালিম আহ্‌মেদ

ভূমিকা

জনৈক ইতিহাসবেত্তা সতর্কতার সঙ্গে নিটোল আর গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্তব্য করেছেন: একজন ইতিহাস-শিক্ষক একটি জাতিকে গড়তে পারেন, আবার ধ্বংস করে দিতেও পারেন। মোদ্দা কথা, সঠিক ইতিহাস-শিক্ষণ ও পাঠনপদ্ধতি জাতির মঙ্গল করতে পারে; বিকৃত ইতিহাসচর্চা কোনো জাতির সামনে নিষ্কৃতি-হীন সমস্যার সৃষ্টি করে। বিকৃত ইতিহাসচর্চা যে এদেশে সাম্প্রদায়িকতারূপ বিষবৃক্ষকে মহীরুহে পরিণত করেছে—সেটি বিপানচন্দ্র ফালাফালা করে চিরে দেখিয়েছেন বহুবার, বহুভাবে। মুক্তমতি ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব, "সেকুলার অ্যানড সায়েনটিফিক হিস্ট্রি"-গবেষণার ওপর অশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রশ্নটি পুনঃপুন তুলেছেন। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের আলোচনাসভায় "সেকুলার অ্যানড সায়েনটিফিক টেকসট বুক"-রচনার দাবি বারবার উঠেছে সঙ্গত কারণেই। আদতে, তাত্ত্বিক ক্ষেত্র থেকে সাম্প্রদায়িকতা আর ভেদবুদ্ধির উচ্ছেদ অপরিহার্য বিষয়। তা না হলে মুক্তবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে উঠবে। এর ফলে সামাজিক জীবনে ভুল-বোঝাবুঝির ব্যাপক অবকাশ থেকে যাবে।

একদা ব্রিটিশ দার্শনিক কার্লাইল মন্তব্য করে-ছিলেন, ইতিহাস খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবনগাথা। এই ধারণার দ্বারা চালিত হয়েই বহুকাল যাবৎ এই উপমহাদেশের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকগুলো রচিত হয়ে এসেছে। ফলত রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অর্থাৎ রাজা-সুলতান-বাদশাহ এবং গভর্নর-জেনারেলদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণ এইরকম: ভারতবর্ষ সম্পর্কে রচিত ইতিহাসগ্রন্থের অধিকাংশই নাম, বংশ, রাজা, জীবনী প্রভৃতির লম্বা ফিরিস্তি। কে. এম. পানিক্করও চীনে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সেখানে ভারত-ইতিহাসকে কতকটা বিদ্রূপ করেই টেলিফোন ডাইরেক্টরির সঙ্গে তুলনা করা হত। কিন্তু এখন ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা একমাত্র বিচার্য বিষয় বলে গণ্য করা হয় না। মানবসমাজের অগ্রগতির ধারাবাহিক ক্রমবিকাশের আলোচনা আর বিশ্লেষণ-ই হল ইতিহাসের মূল আলোচ্য বিষয়। সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইতিহাসের গতিরেখা বিশ্লেষণ করা জরুরি।

সিলেবাস পর্যালোচনা

সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ নবম (১৯৮৮) এবং দশম (১৯৮৯) শ্রেণীর জন্য বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাসের এমন একটি সিলেবাস তৈরি করেছেন, যাতে ভারত-ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়-সমূহের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। পাঠ্যসূচীটি খুঁতয়ে দেখা যাক: মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ-প্রবর্তিত নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে প্রাচীন কাল থেকে ১৮৫৭ সালের 'মহা-বিদ্রোহ'—নবম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হয়েছে। ভারতের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকক্ষেত্র, ভারতসংস্কৃতির বৈচিত্র্য, ধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শ ও ঐতিহ্য, বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবদান অর্থাৎ ভারতীয় ইতিহাসের মূলধারা ও বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত, সচেতন ও আগ্রহী করে তোলার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। অপ্রাসঙ্গিক খুঁটিনাটি আর অনুপুঙ্খ বর্ণনা ব্যতিরেকে স্মর্তব্য তথ্য এবং নির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রাসঙ্গিক ঘটনাবিন্যাসের মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতার দিকচিহ্নের রূপরেখা হাজির করার উদ্দেশ্য প্রতিভাত হয়েছে। বিতর্কিত সমস্যা নিয়ে আধুনিক গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেবার সুযোগ রয়েছে। গতানুগতিক রক্ষণশীল মতামতের ওপর পুরোপুরি নির্ভর না করে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রথম থেকেই নিজেদের যুক্তি, তর্ক, বুদ্ধিবিবেচনা প্রয়োগ করতে সাহসী হয়, অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে—সেটিও খুব সম্ভব পর্ষদের উদ্দিষ্ট।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ-কর্তৃক প্রবর্তিত দশম শ্রেণীর নতুন পাঠ্যসূচীতেও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ফলাফল থেকে ১৯৫০ সালের সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ, গণ-প্রজাতন্ত্রী ভারতের অভ্যুদয় দশম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হয়েছে। পর্ষৎ এই পর্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। সমাজের বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত শ্রেণীর আন্দোলন এবং শোষিত শ্রেণীর উত্থান ও আন্দোলনের মিলিত প্রয়াসের মারফত ভারতবাসী ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়েছিল—সেটি স্বীকৃত হয়েছে। সাম্রাজ্য-বাদী শক্তির ভেদনীতি, ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ভ্রান্তি আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব, এবং আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি আলোচনার নির্দেশ পাঠ্য-সূচীতে রয়েছে। আদিবাসী-উপজাতি, শ্রমিক-কিষাণ আন্দোলন উপেক্ষিত নয়, গুরুত্ব পেয়েছে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে ইংরেজদের রাজ্য-শাসনীতির অবসান হয়েছিল এবং ইউরোপীয় উদ্যোগে রেলপথ স্থাপন, শিল্পের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। শ্রম-জীবী সম্প্রদায়তাদের সুযোগসুবিধার জন্য আন্দোলন করেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র ও অহিংস আন্দোলনের একটি যুক্তিগ্রাহ্য পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষ করা গেছে। জাতীয় সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতা, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি গণ-সমাবেশের চিত্রটি পরিস্ফুটনের সুযোগ পর্ষৎ রেখেছেন। এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর একটি অধ্যায় রচনার নির্দেশ আছে, সেটি হচ্ছে—এ দেশে মুসলিম রাজনীতির গতিধারা। ঐক্যবদ্ধ, ধর্মনিরপেক্ষ এবং সার্বভৌম ভারতের স্বপ্ন আমরা প্রতিনিয়ত দেখে থাকি—তাকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য নিজের দেশ, দেশবাসী আর বিভিন্ন জাতিসত্তা সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট ধারণা থাকা একান্তভাবে অপরিহার্য। স্বীকার্য, পর্ষৎপ্রবর্তিত বিজ্ঞানসম্মত সিলেবাসটি প্রশংসার যোগ্য।

পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি

গত চার দশক ধরে আধুনিক গবেষণার ফলে ভারত-ইতিহাসের বহু বিতর্কিত বিষয়ের ওপর নতুনভাবে আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে। ফলত রক্ষণশীল এবং প্রচলিত ধারণা বহু ক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত কারণে, পরিবর্তিত হয়েছে। স্বভাবতই সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস-গবেষণা-জনিত সিদ্ধান্তের সঙ্গে আন্তরিক পরিচিতি এবং বিশ্বাস না থাকলে পর্ষৎ-নির্দেশিত পাঠ্যপুস্তক রচনা করা সম্ভব নয়। বস্তুত প্রচলিত ধ্যানধারণা মোতাবেক বর্তমান পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হলে পর্ষদের উদ্দেশ্যও অকাথকর হয়ে উঠবে। এই প্রেক্ষিতে পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের অভিপ্রায়েই বর্তমান আলোচনাটির অবতারণা। শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা ব্যতিরেকে কয়েকজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিকও মাধ্যমিক-সিলেবাস-নির্ভর পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়ণ করেছেন। এবারে মূল আলোচনায় প্রবেশ করা যাক।

মিশ্র সংস্কৃতি

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে ভারতবর্ষ 'পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র সংস্করণ'—(epitome of the world)। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ভারতবর্ষকে প্রধানত দু ভাগে বিভক্ত করা

মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ অনুমোদিত কুড়িখানি ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক অবলম্বনে এই আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণত এই বই-গুলিই বেশির ভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়ে থাকে।

হয়েছে। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত অঞ্চল "আর্যাবর্ত" বা "উত্তরাপথ" এবং বিন্ধ্য থেকে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত অঞ্চল "দাক্ষিণাত্য" বা "দক্ষিণাপথ" নামে পরিচিত। উত্তরভারতের সভ্যতা "আর্যসভ্যতা", দক্ষিণ ভারতীয় সভ্যতা মূলত "দ্রাবিড় সভ্যতা"। প্রাচীন ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছিল "দ্রাবিড়-জাতি"। বিদেশাগত আর্যজাতি "উত্তরাপথে" প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। দ্রাবিড়জাতির পর আর্যজাতি সুসভ্য হিসেবে উত্থিত হয়। অনেকেই "আর্যাবর্ত"কে "আর্যদের পবিত্র বাসভূমি", "ভারতের হৃৎপিণ্ড" এবং প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে চিত্রিত করে শ্লাঘা বোধ করে থাকেন। এটি সমর্থন-যোগ্য নয়, কেননা যাঁরা উত্তর ভারতের আর্যসভ্যতাকে "ভারতীয় সভ্যতা"র সমার্থক হিসেবে জ্ঞান করেন, তাঁরাই এই মতের প্রবক্তা। মনে রাখা দরকার যে দীর্ঘকাল উত্তরের কোনো শক্তিশালী রাজা দাক্ষিণাত্যে প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারেন নি। ফলে আর্যাবর্ত থেকে বহুকাল বিচ্ছিন্ন থেকে দাক্ষিণাত্য প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ধারক হিসেবে এক সম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র ইতিহাস গড়ে তুলেছিল। আর্য প্রভুত্বের ও শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্বটি প্রাধান্য পেলেও লক্ষ করার বিষয় এই যে, আর্য সংস্কৃতি কিন্তু সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। মধ্য দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে, পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে অনার্য সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। এতৎসত্ত্বেও কোনো-কোনো পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা মন্তব্য করেছেন যে, ভারতীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি হচ্ছে "আর্য সংস্কৃতি"। ভারতবর্ষ "কমপোজিট কালচারের দেশ"—এই বিষয়-টির ওপর মর্যাদা আরোপ করলে সিদ্ধান্তে স্ববিরোধিতা আর তালগোলপাকিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে 'মহামানবের সাগরতীর'-রূপে বর্ণনা করেছেন। ভিনসেনট স্মিথ এদেশকে চিন্তা করেন, 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' বা 'জাতিতত্ত্বের সংগ্রহশালা' (an ethnological museum) হিসেবে। বিভিন্ন সময়ে বিদেশ থেকে এদেশে এসেছিল গ্রীক, পারসিক, শক, কুষাণ, হূণ, গুর্জর প্রভৃতি জাতি। মধ্যযুগে ইসলামধর্মী যেসব জাতি রাজ্যস্থাপন করে বসবাস করে তাদের মধ্যে বিশিষ্ট হল, তুর্কী, আফগান (পাঠান), মোঙ্গল এবং আবিসিনীয় জাতি। পরবর্তী কালে সমুদ্রপথে পাশ্চাত্য জগৎ থেকে এসেছে পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসি এবং ইংরেজ। প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভাষা, ধর্ম, জাতি, সামাজিক রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির দিক দিয়ে বৈচিত্র্য সত্ত্বেও একটি "মূলগত ঐক্য" (Fundamental unity of India) অর্থাৎ "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য" (unity in diversity) ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের মূলতত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন যে, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা ভারতবর্ষের চির-দিনের একমাত্র প্রচেষ্টা। স্বীকার্য, দু হাজার বছরের হিন্দু ও বৌদ্ধ আধিপত্যের সময়ে রাজনৈতিক বিভেদ, ভাষা, ধর্ম ও রীতিনীতির পার্থক্য ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর একটি নতুন সংস্কৃতি ও জীবনধারার প্রবর্তন হয়। ইসলাম এদেশেরই একটি ধর্মে পরিণত হয়। বহু কাল একসাথে বসবাস করার ফলে হিন্দু ও ইসলামি সংস্কৃতির মিলনে এক মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান পৃথক ও স্বতন্ত্র হলেও একে অপরকে জীবনের সর্ববিধ ক্ষেত্রে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু রক্ষণশীলরা এই সত্যটি মানতে রাজি নন। রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী ঐতিহাসিকবর্গ বিশ্বাস করে থাকেন যে ভারতবর্ষের ঐক্যবোধ হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এর প্রভাব পাঠ্যগ্রন্থপ্রণেতাদের একটি বিরাট অংশকে প্রভাবিত করেছে। জনৈক বিশিষ্ট গ্রন্থপ্রণেতা লিখেছেন, 'দেবভূমি ভারতবর্ষের সংখ্যা-গরিষ্ঠ হিন্দুদের মধ্যে রয়েছে এক ধর্মীয় ঐক্য।.....

বৈদিক সাহিত্য, গীতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতের মতো কাব্যগ্রন্থ ও মহাকাব্য ভারতের জাতীয় ঐক্য-বোধকে সুদৃঢ় করেছে।' এটি কি অখণ্ড ভারতীয় মানসিকতার পরিচয় বহন করে? হুণ সনাতনবোধে আচ্ছন্ন একজন প্রবীণ পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা লিখেছেন যে, হিমালয় ভারতের ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক। ভারতীয় সাধনার পীঠস্থান 'দেবতাত্মা হিমালয়।' আন্তর্জাতিকখ্যাতিসম্পন্ন এক ঐতিহাসিক তাঁর রচিত গ্রন্থে লিখেছেন যে, পুণ্যসলিলা নদীগুলো হিন্দুধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার জন্য নাকি এদেশে ধর্মীয় ঐক্য সম্ভব হয়েছে। বহুজাতিক ও বহুধর্মাবলম্বী দেশে এই তত্ত্ব কিভাবে ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে? এটি ভেবে দেখা দরকার।

রাজনৈতিক ঐক্যের আদর্শ: প্রাচীন নয়

প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকেই এই মত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্যের আদর্শ সুপ্রাচীন। প্রাচীন কালে ভারতীয় সভ্যতার প্রবর্তকরা এই দেশের ভৌগোলিক ঐক্য সম্পর্কে একটি ধারণা পোষণ করলেও রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণা সেই সময়ে ক্রিয়াশীল ছিল না, যা ছিল তা তত্ত্বে, সাহিত্যে, স্নানমন্ত্রে এবং ধর্মবিশ্বাসে। মাত্র ১৫০ বছর আগেও "ভারতবর্ষ"-নামক আইডিয়াটির অস্তিত্ব ছিল না। "ভারতবর্ষ" নাম উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে সাধারণ মানুষের মনে তখনও আসমুদ্রহিমাচল এক বিশাল ভূখণ্ডের ধারণা জাগে নি। পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতাবর্গ এই বিষয়টিতে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকৃত তথ্যটি পেশ করতে পারতেন।

বৈদিক সভ্যতা ও প্রতিবাদ-আন্দোলন

তৃতীয় অধ্যায়টি বৈদিক সভ্যতা তথা আর্যদের ভারতে আগমন ও বিকাশ সংক্রান্ত। আর্য কথাটির অর্থ হল 'শ্রেষ্ঠ', সংকুলজাত বা সুসভ্য। আর্য সভ্যতাকে "আদিবৈদিক" ও "উত্তরবৈদিক"—এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। ঋগ্বেদে বর্ণিত আর্যসভ্যতাকে আদি বৈদিকসভ্যতা বলা হয়। আর্যসমাজব্যবস্থার দুই প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল "বর্ণভেদ" ও "চতুরাশ্রম"। বর্তমানে হিন্দুসমাজের বর্ণভেদ- ও জাতিভেদ-প্রথা বৈদিক যুগের বর্ণভেদপ্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ডি. ডি. কোশাম্বী মনে করেন, বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে বর্ণভেদের কঠোরতা ছিল না। কিন্তু কালক্রমে বর্ণভেদ-প্রথা ভয়ানকভাবে কঠোর ও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। ভারতের আদি অধিবাসীদের আর্যরা "অনার্য", "দাস" হিসেবে বিবেচনা করত। আর্যরা এদের নির্মমভাবে ধ্বংস করে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শূদ্রদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—শূদ্র অপরের দাস, যখন ইচ্ছে তাকে বহিষ্কার ও হত্যা করা যায়। অস্পৃশ্য মনে করে মানুষকে ঘৃণা করার সংস্কার জাঁকিয়ে বসে। নারীস্বাধীনতা, সামাজিক মর্যাদা, নারীদের সম্পত্তিভোগ বা উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি লাভ থেকে বঞ্চিত করার প্রয়াস মনুসংহিতায় স্পষ্ট হয়ে আছে। ব্যয়বহুল আচার-অনুষ্ঠান, দুর্বোধ্য যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড ক্রমশ জটিল হওয়ায় ফলে পুরোহিতশ্রেণীর প্রাধান্য স্থাপিত হয়। অন্তহীন সমস্যায় সাধারণ মানুষের জীবন জর্জরিত ছিল। ব্রাহ্মণেরা ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করেন। প্রাচীন বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে "প্রতিবাদ-আন্দোলনের" সূত্রপাত হয়। বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় আরণ্যক ও উপনিষদে। সামরিক, রাজ-নৈতিক, এমনকী প্রজ্ঞার ক্ষেত্রেও ক্ষত্রিয়রা তাঁদের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সচেতন হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'ষোড়শ জনপদে' ক্ষত্রিয়রাই ছিলেন শাসকশ্রেণী। বিশেষ আপত্তির সঙ্গে তাঁরা সমাজবিন্যাসে ব্রাহ্মণদের প্রথম স্থান মেনে নেন। বৈশ্যশ্রেণীও সমৃদ্ধিলাভ করেন এবং তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, তাঁদের ধনসম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও দরিদ্র ব্রাহ্মণরা ধর্মের নাম করে তাঁদের

ওপর আধিপত্য করেছেন। ফলত, ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে মনোভাব জেগে ওঠে। নিরীশ্বরবাদী আজীবক সম্প্রদায় "নিমিত্তবাদ" প্রচার করেন এবং নিরীশ্বরবাদী চার্বাক ও তাঁর অনুগামীরা "জড়বাদ" প্রচার করেন। আজীবক ও চার্বাকপন্থীরা পুরোহিতদের অর্থহীন কঠোর অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে সংস্কৃতের কোনো প্রভাব ছিল না। তাঁরা "প্রাকৃত" ভাষা ও "মাগধী" ভাষা ব্যবহার করতেন। গৌতম বুদ্ধ "মাগধী"তে জনসাধারণের মধ্যে তাঁর শিক্ষা প্রচার করেন। তিনি ছিলেন প্রাচীন ভারতবর্ষের 'প্রথম বিদ্রোহী সন্তান'। ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে বিরাট বৈপ্লবিক ঘটনা। বেদের অভ্রান্ততা, অপৌরুষেয়তা, আর ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস এবং জাতিভেদের প্রতি বিতৃষ্ণা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল। বুদ্ধ ছিলেন বাস্তবচেতনাসম্পন্ন ধর্ম-সংস্কারক। হিন্দু দেবদেবীও উভয় ধর্মে অস্বীকৃত। যদিও জৈনরা পরবর্তী কালে পুজোপার্বণে কিঞ্চিৎ আসক্ত হয়ে পড়ে। বর্ণভেদহীন এই ধর্মীয় আন্দোলন অহিংসা, উদারতা, যুগোপযোগী নমনীয়তা, সকল মানুষের সমান অধিকার ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিল। স্বভাবতই ব্যবসায়ী, কারিগর, কৃষিজীবী আর নিম্ন-বর্ণের দরিদ্র মানুষ বৌদ্ধধর্মগ্রহণে আগ্রহী হয়। যুদ্ধই একমাত্র পেশা ছিল না—এমন ক্ষত্রিয়রাও দলে-দলে বৌদ্ধমত গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—এই দুই শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। স্পষ্ট উচ্চারণ করা যেতে পারে—এই আলোচনায় পাঠ্য-পুস্তকপ্রণেতারা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের মনে বহু সঙ্গত প্রশ্নের উদ্রেকে তাঁরা সহায়তা করেছেন। বিশিষ্ট একজন ঐতিহাসিকের লিখিত একটি পাঠ্যপুস্তকে বলা হয়েছে যে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকার করেছে। এটি সঠিক নয়। খুব সম্ভব এটি মুদ্রণপ্রমাদ।

ধর্মাশোক

'চণ্ডাশোক' থেকে 'ধর্মাশোক'-এ রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যেই অশোকের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে। 'ধর্মাশোক' ছিলেন বৌদ্ধ। রোমিলা থাপার মন্তব্য করেছেন, 'ধম্মনীতি' গ্রহণ করেও অশোক 'এক নীতিনির্ভর কার্যকর ও উপযোগী জীবনপদ্ধতি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন।' আধুনিক কালে হিন্দু অভ্যুত্থানবাদীরা অশোকের ওপর 'হিন্দুত্ব' আরোপ করে তাঁকে 'হিন্দু ভারতের' শ্রেষ্ঠ সন্তান আর শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিকতা-বাদী শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হন। সর্বাত্মক সেবাধর্মের আদর্শ তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের মধ্যে একজন করে তুলেছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, প্রাচীন যুগের ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে তাঁর কোনো উল্লেখ নেই। পুরাণে তাঁকে শুধু একজন মৌর্য রাজা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর কারণটি পরিষ্কার : অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর সমর্থনের কথা কখনই গোপন করেন নি। পাঠ্যপুস্তকে এই বিষয়টির উত্থাপন বাঞ্ছনীয় ছিল।

সুবর্ণযুগ : প্রকৃত চিত্র

পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতাবর্গ গুপ্তযুগকে ইতিহাসে "সুবর্ণ যুগ" এবং ভারতে "হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির" প্রতিষ্ঠার যুগ হিসেবে বর্ণনা করতে বিশেষভাবে উৎসাহী হয়েছেন। স্মর্তব্য যে, গুপ্তশাসন উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। উত্তর ভারতের ইতিহাস কি পুরো ভারতবর্ষের ইতিহাস? উপরন্তু, একালের শিল্পকলার বিকাশ ঘটেছিল বৌদ্ধ মঠগুলোর অনুপ্রেরণায়। বৌদ্ধদের তৎপরতায় চিকিৎসাবিদ্যা, কারুশিল্প প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য যুগে অবহেলিত বিদ্যার নতুন করে চর্চা শুরু হয়। অহিংসা নীতি গুপ্তযুগে চর্চিত হয় নি। বৌদ্ধধর্মের বিনাশের মধ্যে দিয়েই ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল, পরধর্মসহিষ্ণুতা উপেক্ষিত হয়েছিল—এসব কথা

অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকেই অনুল্লেখিত থেকেছে। "ভারতীয় সভ্যতার রূপরেখা"-নামক গ্রন্থটিতে অবশ্য ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়েছে। বলা হয়েছে, 'গুপ্ত-যুগের সভ্যতা ভারত ইতিহাসে সুবর্ণযুগ এনেছিল কিনা' সে বিষয়ে অবশ্য কেউ-কেউ আজকাল ভিন্ন মত পোষণ করেন। রোমিলা থাপারের মতে, এই সভ্যতা ছিল সমাজের ওপরতলার লোকের জন্য সৃষ্ট। নিম্নশ্রেণীর লোকের সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল না।..... সেই আমলে সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌গতি লক্ষ করা যায়। অস্পৃশ্যতা নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছিল।...নারীর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করছিল বাল্য-বিবাহ ও সতীদাহের প্রচলন। উত্তর ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে ভূমিদাসপ্রথার বিকাশ ঘটেছিল। ...জমি হস্তান্তরিত হলে চাষীরাও হস্তান্তরিত হত। ...ভারতবর্ষের সঙ্গে রোমের বাণিজ্য-সম্পর্কেও অবনতি দেখা দিয়েছিল; এতে ভারতীয় অর্থনীতি আহত হয়, পতন ঘটে গাঙ্গেয় সমভূমিতে অবস্থিত কয়েকটি নগরের।'

প্রাচীন যুগের অবসান

শশাঙ্ক এবং হর্ষবর্ধনের আলোচনায় সকলেই পরিমিতি-বোধের পরিচয় দিয়েছেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়ের ইতিহাস দীর্ঘকালের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বাঙলার এই দুর্দিন ইতিহাসে "মাৎস্যন্যায়" বলে বর্ণিত হয়েছে। পালরাজবংশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গোপাল এই অবস্থাটির পরিবর্তন ঘটান। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলাদেশে সেনবংশের অভ্যুত্থানের ফলে পালশাসনের অবসান ঘটে। খুব সম্ভব ১২০১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে মুসলমান বিজেতা মুহম্মদ ঘোরির অনুচর এবং কুতুবউদ্দিন আইবকের অন্যতম বিশিষ্ট সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করে নদীয়া দখল করেন। ফলত, বাঙলায় ইসলামধর্মীদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক আধিপত্যস্থাপনের দ্বন্দ্বে দাক্ষিণাত্যের চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, পল্লব, এবং চোলরাজ্যের শাসকগোষ্ঠীর কৃতিত্বের বিষয়টি চমৎকার আলোচিত হয়েছে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

প্রাচীন ভারতবর্ষের আলোচনায় সপ্তম অধ্যায়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে স্থল ও জলপথের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে মধ্য এশিয়া, চীন, তিব্বত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগের বিষয়টি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলবে। ভারতীয় সামন্ত-তন্ত্রের উদ্ভবের এবং বিকাশের প্রাথমিক আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে যুক্তিসহকারে। ভূমি- ও কৃষিনির্ভর সমাজে সামন্ততন্ত্র স্বাভাবিকভাবেই সমাজ-ব্যবস্থাকেই নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিল। ফলে সচ্ছলতা থাকলেও সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা ছিল না। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সমাজ, সমাজে নারীর স্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, আমোদ-প্রমোদ, যানবাহন, কৃষি ও রাজস্ব, শিল্প, ব্যাবসা-বাণিজ্য, মুদ্রাব্যবস্থা, ভাষা ও সাহিত্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, ধর্ম, শিল্পকলা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কতিপয় পাঠ্যপুস্তকরচয়িতা আলোচনার সুবিধের জন্য উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারত—এই দুই শিরোনামে আলোচনা করেছেন। ফলত উভয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বর্ণভেদের কঠোরতা, উপবর্ণের উদ্ভব ও তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি, ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্য, হিন্দুসমাজের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি, বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের উত্থান, অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত শংকরাচার্য এবং বৈষ্ণব দার্শনিক রামানুজের আবির্ভাব,

ভক্তি-আন্দোলনের ফলে সমাজজীবনে আলোড়ন, মনুস্মৃতিতে নারীদের চিরস্থায়ী বশবর্তিতার মৌলিক তত্ত্বানুসারে তাঁদের অবস্থার অধোগতি, বাল্যবিবাহের প্রচলন এবং বিধবাবিবাহের ওপর নিষেধাজ্ঞার কঠোরতা, স্বেচ্ছায় বা বলপ্রয়োগের মারফত সতীদাহ, ক্রীতদাসপ্রথার প্রচলন, মন্দিরের দেবদাসীদের বারবণিতায় রূপান্তর—সব মিলিয়ে এই কালপর্বে নৈতিকতার মান নীচে নেমে যায়। উপেন্দ্রনাথ ঘোষালের বরাত দিয়ে একটি পাঠ্যগ্রন্থে বলা হয়েছে যে, গুজরাতের চার হাজার মন্দিরে কুড়ি হাজারেরও বেশি নর্তকী ছিল। অদ্বৈতবাদের প্রভাবে নৃপতি থেকে সাধারণ মানুষ উদ্যোগহীন হয়ে পড়েছিল। এদেশের পণ্ডিতবর্গ বহির্গত কোনো জ্ঞান সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। একাদশ শতাব্দীর হিন্দু সমাজের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা দিয়েছেন, আলবেরুনি তাঁর "কিতাব উল-হিন্দ" গ্রন্থে। আরব ভ্রমণকারী আবু জাইদ্ আল হাসান বহু তথ্য রেখে গেছেন। এই যুগে ভারতীয় সমাজ ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়। চালুক্য, রাষ্ট্রকূট ও পাণ্ড্য রাজারা ইসলামধর্মাবলম্বীদের প্রতি বদান্যতা দেখিয়েছিলেন। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রতিও অনুরূপ আচরণ করেছিলেন। দ্বাদশ শতকে বল্লাল সেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য শ্রেণীর মধ্যে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তন করেন। কৌলীন্যপ্রথা হচ্ছে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বংশগৌরব অনুসারে সামাজিক স্তর। এই সময় থেকেই সমাজে ব্রাহ্মণ ছাড়া বৈদ্য ও কায়স্থ শ্রেণীর প্রভাব ও প্রাধান্য সূচিত হয়। বস্তুত আধুনিক বাঙালি হিন্দু সমাজের গড়ন এই যুগেই সূচিত হয়েছিল। ভারতবর্ষে তুর্ক-আফগান শাসন প্রতিষ্ঠাকালে হিন্দুসমাজ গতিহীন ও স্থিতিশীল হয়ে পড়েছিল। এই অধ্যায়টি আলোচনায় অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ দুটি পাঠ্যপুস্তকে গভীর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অবশ্য ব্যাপক ব্যবসায়িক সাফল্য পেয়েছে এমন একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে, আলোচ্য সময়ে ভারতীয় হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও ধর্মোন্মত্ত ব্যবহারের ফলেই হিন্দুসমাজ রক্ষণশীল হয়ে পড়ে এবং হিন্দু ও মুসলিম সমাজের সমন্বয়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। খোলাখুলি বলা দরকার যে, আধুনিক গবেষণার ফলে এসব অভিযোগের শিকড় বেশ কিছুকাল আগে থেকেই সমূলে উৎপাটিত হয়ে গেছে।

আরব বণিক : প্রাচীন ভারতে

এদেশে রাজনৈতিক ইসলামের প্রবেশের বহু পূর্ব থেকেই আরব বণিকদের সঙ্গে পশ্চিম ভারতের উপকূলের বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল। দ্বিতীয় খলিফা ওমরের আমলে আরব বণিকরা এদেশে বসতি স্থাপন করে। তারা দক্ষিণ ভারতের নৃপতিদের ঘোড়া এবং দক্ষ জাহাজচালকের জোগান দিত। এইভাবেই আরব মুসলমান বণিকদের সঙ্গে হিন্দুরাজাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আরবদের মাধ্যমেই ভারতীয় বণিকদের পাশ্চাত্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল।

ভারতে ইসলামের আগমন

আরবের একজন তরুণ দক্ষ সেনাপতি মহম্মদ বিন কাশিমের উদ্যোগে ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুবিজয়ের মারফত ভারতে ইসলামের আগমন ঘটে। সিন্ধুরাজ গোঁড়া-ব্রাহ্মণ দাহির বৌদ্ধপ্রজা ও সামন্তদের প্রতি ব্যাপক দুর্ব্যবহার করেছিলেন। ফলত, এই বিক্ষুব্ধ প্রজাদের সাহায্য পেয়েছিলেন আরবরা। প্রায় তিনশ বছর ধরে সিন্ধুদেশে আরব-দখল বহাল ছিল। সিন্ধুদেশ জয়ের পর আরব শাসকরা বিজিতদের প্রতি উদারতা দেখায়। ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রচলিত ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থা ও স্থানীয় কর্মচারীদের চাকরির সুযোগও কেড়ে নেওয়া হয় নি। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গজনীর মামুদ সিন্ধু দেশের আরব রাজ্য অধিকার করেন। আরবরা হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিবেশিসুলভ মনোভাব নিয়ে শান্তি ও মৈত্রীর সঙ্গে বসবাস করেন। আরবরা ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান স্বীকরণ করেন। এই বিদ্যা ও জ্ঞান তারা ইউরোপীয় দেশেও প্রচার করেছিল। আমির খসরুর রচনা থেকে জানা যায় যে, আরব জ্যোতির্বিদ আবু মাশার বারাণসীতে এসে দশ বছর জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। ভারতে রাজনৈতিক ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট ও তৎকালীন উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজপুতবংশীয় নৃপতিদের ঈর্ষা-পরায়ণতা ও পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ফলেই যে বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে কোনো সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ তাঁরা গড়ে তুলতে পারেন নি—সেটি যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যায়িত হয়েছে।

মুসলিম যুগ নয়—মধ্যযুগের ভারত

শাসক বংশের ধর্মীয় পরিচয়ের প্রেক্ষাপট থেকেই প্রাচীন যুগ আর মধ্যযুগের ইতিহাসকে "হিন্দুযুগ" ও "মুসলিম যুগ" বা "মুসলিম ভারত" বলে অভিহিত করা হয়েছে এযাবৎকাল। শাসক শক্তির উত্থান ও পতনের সঙ্গে ধর্মকে যোগ করে ভারতীয় ইতিহাসের যুগবিভাগ অর্থাৎ ভারতের ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা আজ আর স্বীকৃত নয়। স্বভাবতই ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসকে "মুসলিম যুগ" বলার পরিবর্তে কেন আমরা "মধ্যযুগের ভারত" বলব তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতারা। এটি বিশেষভাবে আশার কথা। পর্ষদের নির্দেশেই এই ব্যাখ্যাটি তাঁরা করেছেন। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় এই যে, প্রাচীন যুগ সম্পর্কে এমন কোনো নির্দেশ সিলেবাসে নেই। ফলত পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতাবর্গ প্রাচীন যুগকে বহুক্ষেত্রে "হিন্দু যুগ" বলেই বর্ণনা করেছেন। এটি সঠিক নয়; কারণ মৌর্য, ইন্দো-গ্রীসীয়, শক, কুষাণ প্রভৃতি বহু প্রধান রাজবংশই অহিন্দু ছিল। অনেক রাজাই ছিলেন বৌদ্ধ। তাহলে কি আমরা মনে করব যে প্রাচীন যুগে ভারতে একটি বৌদ্ধযুগও ছিল? বহুলপঠিত একটি পাঠ্যপুস্তকের জনৈক প্রণেতা তো পরিষ্কার লিখেছেন, 'প্রাচীন অর্থাৎ হিন্দু যুগেই…' ইত্যাদি ইত্যাদি। আশা করা যায় পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ বিষয়টি ভেবে দেখবেন। প্রাচীন ভারতের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা বহু বিপত্তির কারণ হয়েছে—এটি তো সর্বজনবিদিত। পাঠ্যপুস্তকে অবশ্য শিরোনাম হিসেবে "প্রাচীন যুগ" বা "প্রাচীন ভারত" ব্যবহৃত হয়েছে।

তুর্কি শাসনের সূচনা

একাদশ শতাব্দীর একেবারে শুরুর বছর থেকেই আফগানিস্তানের অন্তর্গত গজনীর সুলতান মামুদ পুনঃপুন ভারতবর্ষ আক্রমণ করে ভারতে তুর্ক-আফগান রাজনৈতিক শক্তির আগমনের পথকে পরিষ্কার করে দেন। মামুদ ছিলেন ভারতে তুর্কি শাসনের অপ্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠাতা। ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ পানজাব দখল করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে শিখ-শক্তির আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত পানজাবে ইসলামধর্মীদের শাসন কায়েম ছিল। মামুদের ভারত অভিযানের কালেই আবু রিহান মোহাম্মদ আলবিরুনি তাঁর সহচর হিসেবে 'হিন্দুস্তানে' এসেছিলেন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সুন্দর একটি বিবরণ রেখে গেছেন। স্মর্তব্য যে আলবিরুনি ভগবদ্গীতার দার্শনিক প্রভাবে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। আলবিরুনির মতে, এদেশের লোকের প্রধান দোষ ছিল যে, 'তারা বিদেশীর কাছ থেকে কিছু শিখতে বা তাদের সঙ্গে মিশতে চায় না; হিন্দুরা মনে করে তাদের দেশ ছাড়া আর দেশ নেই, এমনকি তারা ছাড়া আর কোনো জীবও নেই।' সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের জের হিসেবে এদেশে সুফী ধর্মপ্রচারকরা প্রবেশ করেন। এইভাবে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ ও ধর্মের সঙ্গে পারস্পরিক

আদানপ্রদানের সুযোগ ঘটে। লক্ষ্যযোগ্য বিষয় এই যে, পাঠ্যপুস্তকগুলোতে সুলতান মামুদকে শুধুমাত্র নিষ্ঠুর হত্যাকারী আর মন্দিরলুণ্ঠনকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি, মামুদের চরিত্র ও কৃতিত্বের প্রকৃত মূল্যায়ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষ একটি মূল্যবান পাঠ্যপুস্তকে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অধ্যাপক হাবিবের সুলতান মামুদ সম্পর্কিত একটি সিদ্ধান্ত সংযোজিত হয়েছে।

অভিযান থেকে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

সুলতান মামুদের উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার সুযোগে ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘোরী অধিপতি গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ ঘোরী গজনি অধিকার করে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিহাবউদ্দিন মহম্মদকে গজনি প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর শিহাবউদ্দিন, সুইজউদ্দিন মহম্মদ ঘোরি নামে ঘোরী রাজ্যের (গজনি ও হিরাটের মধ্যবর্তী অঞ্চল) সিংহাসনে বসলেন। ভারতের ইতিহাসে তিনিই মহম্মদ ঘোরী নামে পরিচিত। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও যুদ্ধাভিলাষী মহম্মদ ঘোরীর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতবিজয়। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দের তরাইনের যুদ্ধে ভারতীয়দের চিরাচরিত যুদ্ধপদ্ধতির নিষ্ক্রিয়তা আর রাজনৈতিক অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে তাঁর স্বপ্নকে সফল করে তুললেন। এর অল্পকালের মধ্যেই তাঁর দক্ষ সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবক আর্যাবর্তের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করে ফেলেন। অন্যদিকে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি লক্ষ্মণসেনের কাছ থেকে পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ কেড়ে নেন। একান্ত বিশ্বস্ত ও প্রিয় অনুচর কুতুবুদ্দিন আইবকের ওপর বিজিত ভারতীয় রাজ্যগুলির পরিচালনার ভার অর্পণ করে মহম্মদ ঘোরী গজনি ফিরে যান। এই নতুন রাজ্য "দিল্লীর সুলতানি রাজ্য" নামে পরিচিত। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে কুতুবউদ্দিন আইবকের দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণের সময় থেকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদীর রাজত্বকাল সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত সময়সীমাকে "সুলতানি আমল" বলা হয়। কুতুবউদ্দিন স্বাধীন সুলতান হিসাবে শাসন শুরু করেছিলেন। এই কারণে কুতুবউদ্দিন আইবককে দিল্লীর স্বাধীন সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা-রূপে অনেকেই গণ্য করেন। কুতুবউদ্দিন-প্রতিষ্ঠিত "তুর্কি সুলতানি বংশ"কে এযাবৎকাল পাঠ্যপুস্তক-গুলোতে 'দাসবংশ' (Slave Dynasty) হিসেবে বর্ণনা করা হত। বর্তমান পাঠ্যপুস্তকগুলো যুক্তি-সহকারে তা খণ্ডন করেছে। শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়টি আকর্ষক হয়ে উঠবে।

সাম্রাজ্যের সংহতি

ইলতুৎমিস (১২১১-১২৩৬) এবং গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭)-এর স্থান ইতিহাসে স্থায়ী হয়ে আছে সুলতানি সাম্রাজ্যের সংহতিবিধানকারী হিসেবে। কবি আমির খসরুর প্রথম পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও বলবন মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। খলজি সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন খলজির ভূমিকার নির্মোহ মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের চিন্তনে ও মননে গভীর প্রভাব বিস্তার করবে। সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন রাষ্ট্রনীতি থেকে ধর্মকে বর্জন করে এক নতুন রাষ্ট্রনীতির প্রবর্তন করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতাস্থাপন, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণে তাঁর অভিনব বিধিব্যবস্থা পাঠ্যপুস্তকগুলোতে প্রাধান্য পেয়েছে। 'পদ্মিনী কিসসা' সম্পূর্ণ সঙ্গত কারণেই উপেক্ষিত হয়েছে। মহম্মদ বিন তুঘলকের প্রতিও পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতাবর্গ সুবিচার করেছেন। চরিত্রের স্ববিরোধী উপাদানের সংমিশ্রণের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে মহম্মদ বিন তুঘলকের উলেমাপ্রভাবমুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা, বিরাট হিন্দু সমাজের প্রতি বদান্যতা, সতীদাহপ্রথা উচ্ছেদের চেষ্টা এবং বিভিন্ন সংস্কার-প্রচেষ্টার মধ্যে তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয়

পেয়েছেন। 'পাগলারাজা' হিসেবে তাঁর পরিচয় ক্রমে-ক্রমে লোপ পাবে বলে বিশ্বাস করা যেতে পারে।

ফিরোজশাহ কি ধর্মান্ধ?

নতুন পাঠ্যসূচী প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বের পাঠ্য বই-গুলোতে ফিরোজ শাহ তুঘলককে ভয়ানক ধর্মান্ধ হিসেবে চিত্রিত করা হত—যেন সেটিই তাঁর একমাত্র পরিচয়। কিন্তু বর্তমানে তাঁর জনকল্যাণমূলক কাজ, শাসনসংস্কার, নতুন নগর নির্মাণ, কৃষির উন্নয়ন, মূল্য-নিয়ন্ত্রণব্যতিরেকেই দ্রব্যমূল্য হ্রাস, শিক্ষার উন্নতিসাধন, বহু সংস্কৃত পুঁথি ফারসি ভাষায় অনুবাদ এবং তাঁর শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা (উলেমাদের প্রভাব, জায়গির পুনঃপ্রবর্তন, ক্রীতদাসের সংখ্যাবৃদ্ধি) ইত্যাকার বিষয় আলোচিত হয়েছে। ব্রাহ্মণদের প্রতি জিজিয়া প্রবর্তনের জন্য ফিরোজকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে কয়েকটি আলোচনায়, কিন্তু একথাও উল্লেখিত হয়েছে যে, সমস্ত অবৈধ কর তিনি বাতিল করেন এবং অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত কোন কর যাতে আদায় করা না হয় সেদিকে তিনি দৃষ্টি রেখেছিলেন। ফলত, কৃষক-সমাজের তাঁর প্রতি কোনো অভিযোগ বা ক্ষোভ ছিল না।

সিকান্দার লোদী

সিকান্দার লোদীর অসাধারণ শাসনদক্ষতার কথা স্বীকৃত হয়েছে। গরিব-দুঃখী প্রজাদের কাছে তিনি বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। তবে তাঁর বিরুদ্ধে হিন্দুবিদ্বেষ তথা মথুরার মন্দির ধ্বংসের অভিযোগ আছে। রাজনৈতিক কারণে সিকান্দার লোদী জৌনপুরের মসজিদ পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছিলেন। এই তথ্যটি পাঠ্যবইরচয়িতারা উল্লেখ করতে পারতেন। মন্দির-মসজিদ ধ্বংসের বিষয়টি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা দরকার।

আঞ্চলিক শক্তি

তুঘলক বংশের পতনের পর কয়েকটি আঞ্চলিক শক্তির আবির্ভাব ঘটে। এর মধ্যে বাঙলাদেশে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) এবং নুসরৎ শাহের শাসনকাল (১৫১৯-১৫৩৩) হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশের জন্য খ্যাত। পাঠ্যগ্রন্থ-গুলোতে এই সময়ের বর্ণনায় বেশ উচ্ছ্বাস লক্ষ করা গেছে। দাক্ষিণাত্যের বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান এ-সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যের নিরন্তর দ্বন্দ্বকে ধর্মীয় সংঘাত হিসেবে বর্ণনা করা হয় নি। এই সংঘর্ষের পশ্চাতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্রিয়াশীল ছিল—এই ব্যাখ্যাটি প্রাধান্য পেয়েছে। এইসব সিদ্ধান্তই হচ্ছে 'সেক্যুলার অ্যানড সায়েনটিফিক হিস্ট্রি' চর্চার ফসল। পাঠ্যগ্রন্থ-প্রণেতাবর্গ এ বাবদে আধুনিক ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র, অধ্যাপক হাবিব ও নিজামির গবেষণাকর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে ইসলামের প্রভাব

সুলতানি আমলে ভারতীয় জীবনে, বিশেষভাবে ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে ইসলামের প্রভাব সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। এই যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সনাতন সংস্কৃতির একটি সংঘাত লক্ষ করা গেছে। মুসলমানরা নিজেদের একটি সুনির্দিষ্ট ধর্ম, সমাজব্যবস্থা, জীবনবোধ, বিশিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বলে বিশ্বাস করত। প্রচণ্ড একেশ্বরবাদী ইসলামধর্মাবলম্বী মুসলমান এবং প্রতীক- ও প্রতিমা-পূজায় বিশ্বাসী হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধ উভয়ের মিলনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে হিন্দু-ধর্মের বর্ণাশ্রমের আদর্শের বিরাট পার্থক্য ছিল।

সামাজিক বৈষম্য ও অত্যাচারে জর্জরিত নিম্নবর্ণের অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্মের সাম্যনীতিতে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এই প্রেক্ষাপটে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে ইসলামের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য হিন্দু শাস্ত্রকারগণ অধিকতর কঠোর বিধিনিষেধ ও সামাজিক রীতিনীতির প্রবর্তন করতে শুরু করেন। ফলে সনাতনধর্মী হিন্দুসমাজে রক্ষণশীলতা আরও বৃদ্ধি পায়। সুখের কথা, হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম-বিরোধী এই প্রতিক্রিয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই সমন্বয়ের মাধ্যমে উভয় ধর্ম ও সংস্কৃতি পরস্পরের প্রতি ক্রমশ শ্রদ্ধাবান ও সহনশীল হয়ে উঠেছিল। অবশেষে সাধিত হয় উভয় সংস্কৃতির মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয়। এই ধারাতেই অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা এই পর্বটি আলোচনা করেছেন। হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক সমন্বয় সম্পর্কে বিশেষ একটি পাঠ্যপুস্তকের সিদ্ধান্ত আমাদের চমকিত করে। সিদ্ধান্তটি এই: 'কিছুকাল আগেও ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা ও তাঁদের অনুসারী হিন্দু জাতীয়তা-বাদী ঐতিহাসিকেরা (যেমন, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার) মেনে নিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের ইতিহাস শুধুমাত্র পারস্পরিক বিরোধেরই ইতিহাস। সংঘাত অবশ্যই ছিল, এবং রাজনৈতিক প্রাধান্যের সেই সংঘাত বিপুল আকার ধারণ করে শেষ পর্যন্ত ভারত-ব্যবচ্ছেদে পর্যবসিত হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সেই সংঘাত ধর্মগত কারণে যতটা তার চাইতে ঢের বেশি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে। ঐতিহাসিকেরা মধ্যযুগে মুসলমান শাসকদের নিষ্ঠুরতার উদাহরণ দেন, কিন্তু মনে রাখেন না যে, বিজয়নগরের মতো সভ্য হিন্দুরাজ্যেও নিষ্ঠুরতার ঘাটতি ছিল না; বস্তুত বিশ্বজোড়া মধ্যযুগীয় শাসকশ্রেণীর বৈশিষ্ট্যই ছিল নিষ্ঠুরতা। কি হিন্দু, কি মুসলমান তখন শাসক-মাত্রেই কমবেশি আধুনিক দৃষ্টিতে নিষ্ঠুর ছিলেন। তেমনি বলপূর্বক ধর্মান্তরের ঘটনা পাওয়া গেলেও ধর্মান্তর ব্যাপক ছিল না। সুলতান মামুদের বারংবার ভারত আক্রমণের পিছনে যে ধর্মান্ধতার বদলে হিন্দু-মন্দিরে লুকোনো ধনরত্নলাভের আকাঙ্ক্ষা কাজ করে-ছিল, সেটাও আমরা দেখেছি। এ ছাড়া স্বীকৃত যে, প্রয়োজনের খাতিরে মুসলমান শাসকেরা হিন্দু স্থপতিকে কাজে লাগিয়েছেন; রাজস্ববিভাগের কর্মচারিগণ ও বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ ও সামরিক বিভাগেও হিন্দুরা উচ্চপদ লাভ করতেন। ……এর ফলেই সাংস্কৃতিক সমন্বয় সম্ভব হয়েছিল।' "কমিউনালিজম অ্যান্ড দ্য রাইটিং অব ইনডিয়ান হিস্ট্রি" (রোমিলা থাপার, হরবংশ মুখিয়া, বিপানচন্দ্র) নামক গ্রন্থটির প্রভাবেই গ্রন্থকার এই সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন। আশা করা যেতে পারে, শিক্ষার্থীদের জন্য এটি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে।

আকবর, রানাপ্রতাপ, শেরশাহ

আওরঙ্গজেব ব্যতিরেকে অন্যান্য মোগল সম্রাটদের শাসনকাল ও শাসনপদ্ধতি বর্ণনায় পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা-বর্গ কিঞ্চিৎ বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ করছেন। বাস্তবধর্মী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের জন্য আকবরকে "জাতীয় সম্রাট" হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে এবং রানাপ্রতাপের "স্বদেশপ্রেম তথা জাতিপ্রেম" সম্মানিত হয়েছে। এই সময়কালীন শাসক হিসেবে শেরশাহ প্রসঙ্গটিও এখানে এসে যাচ্ছে। তাঁকে বলা হয়েছে, প্রতিভাধর, ন্যায়পরায়ণ, সামরিক সংগঠক ও অসাধারণ উদ্ভাবনীশক্তিসম্পন্ন শাসক। রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম মিলনের বিশিষ্ট রূপকার। ধর্মনিরপেক্ষ ও জনকল্যাণকর শাসনপদ্ধতির জন্য পাঠ্য বইয়ের লেখকরা তাঁকে মধ্যযুগের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আকবর ছিলেন শেরশাহের উত্তরসূরী।

আওরঙ্গজেব আর শিবাজী

বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকেই

আওরঙ্গজেবকে ভয়ঙ্কর 'হিন্দু নির্যাতনকারী' হিসেবে ঘোরতর সমালোচনা করা হয়েছে। আওরঙ্গজেব 'অতিরিক্ত বিশুদ্ধতাবাদী' ছিলেন—এটি অস্বীকার করা হচ্ছে না। কিন্তু তাঁকে ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবে প্রমাণ করার দায়িত্বটি সম্পাদন করেছিলেন জাতীয়তা-বাদী তথা সাম্প্রদায়িকতাবাদী ঐতিহাসিকরা। মাঙ্কাতা আমলের সমস্ত অভিযোগগুলোই পাঠ্য-পুস্তকে অতি উৎসাহের সঙ্গে বিবৃত হয়েছে। এমনকী মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য আওরঙ্গজেবকেই দায়ী করা হয়েছে। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই আওরঙ্গজেবের নীতিকে সমসাময়িক রাজ-নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় আলোচনা করে তাঁর বিধিব্যবস্থার মধ্যে যৌক্তিকতা খুঁজে পেয়েছেন। আওরঙ্গজেবের শাসন আমলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নানা ধরনের বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়েছিল—এটি সত্য। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব মনে করেন যে, ওইসব বিদ্রোহ মূলত সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাপ্রসূত, ধর্মীয় প্রশ্ন ছিল গৌণ। পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতারা রক্ষণশীল ঐতিহাসিকদের দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত হয়েছেন। ফলত, তাঁদের সিদ্ধান্ত সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন হয়েছে। এটি শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। পরিষ্কার বলা যেতে পারে—আওরঙ্গজেব সম্পর্কে সতীশচন্দ্র, আতাহার আলি, গৌতম ভদ্র আর ইরফান হাবিবের বিজ্ঞানভিত্তিক নিরপেক্ষ গবেষণাকর্মকে পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতাবর্গ মূল্য দেন নি। [দেখুন, ইতিহাসচর্চা ও সাম্প্রদায়িকতা, চতুরঙ্গ, মার্চ, ১৯৮৭]। অবশ্য "ভারত ও ভারতীয় ইতিহাসের ধারা" নামক একটি পাঠ্যপুস্তকে বলা হয়েছে, 'এ কথা ঠিক যে তিনি ইসলামের নীতি দ্বারা বহুলাংশে পরিচালিত হতেন। তবে তিনি প্রজাদের স্বার্থ উপেক্ষা করতেন না। তিনি…প্রজাদের উপর থেকে বহু রকমের কর তুলে দেন। আওরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বকালের প্রথম দিকে জিজিয়া কর প্রবর্তন করেন নি। এই জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করতে কুড়ি বছর সময় লাগে। এই কর প্রবর্তনের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রয়োজনের প্রত্যক্ষ যোগ দেখা যায়।…ফারুকির মতে, মন্দির ধ্বংসের পিছনে সাধারণভাবে কোন আদেশ জারি করা হয় নি।' "ভারতীয় সভ্যতার রূপরেখা" নামক একটি গ্রন্থে আধুনিক গবেষণার ওপর কিছু মূল্য আরোপ করা হয়েছে। শিবাজীর মহত্ত্বকে বিরাট করে দেখাতে গিয়ে আওরঙ্গজেবকে প্রায় "নরাধমে" পরিণত করেছেন অধিকাংশ পাঠ্যগ্রন্থপ্রণেতা। আধুনিক গবেষণায় শিবাজী বহু সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। সতীশচন্দ্র শিবাজীর শাসনব্যবস্থায় কোনো মৌলিকত্ব খুঁজে পান নি। হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তা গোব্রাহ্মণ-প্রতিপালক হিসেবে শিবাজীর যে পরিচয় রক্ষণশীল ঐতিহাসিকরা দিয়ে থাকেন সেটি সঠিক নয়, কেননা তাঁর প্রতিবেশী হিন্দু প্রজাবর্গ মারাঠা লুঠেরাজ থেকে রেহাই পায় নি। ফলত, শিবাজীর কল্পিত হিন্দু-রাজ্যের ধারণায় সাধারণ হিন্দু সম্প্রদায় পুলকিত হয় নি। একথা ভাবা ঠিক হবে না যে, শিবাজী একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক; কেননা তাঁর আমলে ভারতে জাতীয়তাবোধের জাগরণ দেখা দেয় নি। উপরন্তু তিনি একজন স্বদেশী সম্রাটের বিরুদ্ধে আপন স্বার্থ রক্ষায় লড়াই করেছিলেন। বিশেষ একটি পাঠ্যপুস্তকে অবশ্য উপরের ব্যাখ্যাটি প্রাধান্য পেয়েছে। আশার কথা, কিছু-কিছু শিক্ষার্থী এইসব সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ পাবে। অনেকেই বলে থাকেন যে, মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে শিবাজীর সংগ্রাম পরবর্তী কালে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা ছিলেন 'নব্যহিন্দু জাতীয়তাবাদী'। এই জাতীয়তাবাদ ভারতে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের অভ্যুদয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই বিষয়টি আমাদের মনে রাখা দরকার।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

ব্রিটিশ রাজত্বের শুরু থেকেই এদেশের মানুষ তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করে। হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে কৃষক সমাজ থেকে শুরু করে আদিবাসী-উপজাতি সম্প্রদায়ের নিষ্পেষিত মানুষ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষ প্রকাশ করে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ-তক সুদীর্ঘ একশো বছর নানা শ্রেণীর মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করে চলেছিল। নতুন পাঠ্যক্রম এই অধ্যায়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। "সিপাহী বিদ্রোহ" নামে পরিচিত আন্দোলনটি হিন্দু মুসলমানের যৌথ আন্দোলন, তা সাম্প্রতিককালের শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করতে পারবে। বহুস্থানে হিন্দু-মুসলমান কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর মানুষ স্বেচ্ছায় এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যই ছিল ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের মূল চালিকা শক্তি। লক্ষ-লক্ষ হিন্দু-মুসলমান এই বিদ্রোহে প্রাণ হারিয়েছিলেন। নবাব ওয়াজেদ আলির শহর অযোধ্যাতে দেড় লক্ষ বিদ্রোহী নিহত হয়েছিলেন। পাঠ্যপুস্তকে ফরাজি আর ওয়াহাবি আন্দোলন সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। আন্দোলনের চরিত্রবিচারে পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতাবর্গ রক্ষণশীল এবং আধুনিক উভয়বিধ মতামত এবং বিশ্লেষণ পেশ করার চেষ্টা করেছেন। ফরাজি এবং ওয়াহাবি আন্দোলনে শুধুমাত্র মুসলমানরাই নয়, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও বিশাল সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল। অত্যাচারী জমিদার ও নীলকর সাহেবের বিরুদ্ধে বাঙলার কৃষককুল ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই ত্রি-শরিবোধী চরিত্র অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশুদ্ধ ইসলামে প্রত্যাবর্তনের ঝোঁক থাকলেও ডব্লিউ. সি. স্মিথের মতে, বাঙলার ওয়াহাবি আন্দোলন ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে কৃষকসম্প্রদায়ের এক নিজস্ব আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। ফরাজি ও ওয়াহাবি আন্দোলনের মূল ধারাটা ছিল, গ্রামীণ জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করে; ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যাকে সুশোভন সরকার (অমিত সেন) চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছিলেন, 'রেডরিপাবলিকান ইন ক্যারাকটার' ("নোটস অন বেঙ্গল রেনেসাঁ")। দু-একজন পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা এই প্রসঙ্গে রক্ষণশীল মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা রমেশচন্দ্র মজুমদারের একটি উদ্‌ধৃতি দিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, '…a movement of the Muslims by the Muslims and for the Muslims'। বিচারবিমুখতা থেকেই এমন সিদ্ধান্ত এসেছে। স্মর্তব্য যে, ফরাজি আর ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভারতে সমস্ত কৃষক অভ্যুত্থানের পথপ্রদর্শক। "ভারত ইতিহাসের ধারা" এবং "ভারত পরিচয়" নামক দুটি পাঠ্যপুস্তকে "ফরাজি আন্দোলন"-কে "ফেরাজি আন্দোলন"-রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি সঠিক নয়।

উনিশ-শতকী সংস্কার ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র

উনিশ শতকে বাঙলার সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রটি আলোচিত হয়েছে বটে, কিন্তু প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ প্রকাশ লক্ষ করা যায় নি। উনিশ-শতকী হিন্দুসমাজের সংস্কার আন্দোলন কিভাবে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন আন্দোলনে পরিণত হল, 'হিন্দুপ্রীতি' ক্রমে 'হিন্দুস্বপ্রীতি'র ভিতর দিয়ে সাম্প্রদায়িকতায় রূপান্তরিত হল, রামমোহন, ইয়ংবেঙ্গল, বিদ্যাসাগরের উদারতা ও যুক্তিবাদের মানসিক ধারাটি ক্রমে-ক্রমে অস্ত গেল, যুক্তির বদলে এল সনাতন ভক্তি, সংস্কারের বদলে এল কুসংস্কার, উদারতার বদলে এল সংকীর্ণতা, মানবতার বদলে সাম্প্রদায়িকতা, মুসলমানবর্জিত তথাকথিত নবজাগরণ আন্দোলনের প্রায়শ্চিত্ত করা হল চরম প্রতিক্রিয়াশীল রিভাইভ্যাল আন্দোলনের সূত্রপাত করে; এমনকী বিদ্যাবুদ্ধিযুক্তিসব বিসর্জন ও বন্ধক দিয়ে যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের উত্তরাধিকারীরা গুরু আর অবতারবাদের পাঁকের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়লেন (সমাজতাত্ত্বিক বিনয় ঘোষ এইভাবেই বিশ্লেষণটি করেছেন) এমন মূল্যায়নের উল্লেখ পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকগুলোতে করা হয় নি।

তথাকথিত "দেশাত্মবোধক" সাহিত্য

ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে "দেশাত্মবোধক" সাহিত্যের সার্বিক অবদানের কথা প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকে আবেগসহকারে বর্ণিত হয়েছে। একটি দৃষ্টিনন্দন পাঠ্যপুস্তক থেকে একটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'শ্রীকৃষ্ণের ধর্মরাজ্য' প্রতিষ্ঠার কথা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "কৃষ্ণচরিত্রে" প্রকাশ করেন। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বভারতীয় রাষ্ট্র গঠনের কথা পরোক্ষভাবে প্রচার করেন। স্বাদেশিকতা ও স্বদেশপ্রেমের আদর্শ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "আনন্দমঠ"-এ পূর্ণভাবে বিকশিত। "আনন্দমঠে"র 'বন্দেমাতরম্'-মন্ত্র ভারতে রাষ্ট্রীভাব প্রবুদ্ধ করে এবং এক অভূতপূর্ব দেশপ্রীতির সঞ্চার ঘটায়। "আনন্দমঠ"-এ বর্ণিত একদল দেশপ্রেমিকের আত্মোৎসর্গের আদর্শ প্রচার করে বঙ্কিমচন্দ্র পরোক্ষভাবে বিপ্লবী আদর্শের কথা প্রচার করেন।' এই ধরনের "দেশাত্মবোধক" সাহিত্য সমস্ত শ্রেণী আর ধর্মবিশ্বাসের মানুষকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে তো পারেই নি, উপরন্তু কোনো-কোনো অংশে বিচ্ছিন্ন মানসিকতা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। এইসব প্রশ্ন পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতাদের ভাবিত করে তোলে নি। স্মরণে রাখা দরকার যে, মধ্যশিক্ষাপর্ষদ জাতীয় আন্দোলনের ওপর বিজ্ঞানভিত্তিক নির্মোহ মূল্যায়ন প্রত্যাশা করেছে। বিভিন্ন ধারায় উত্থিত জাতীয় আন্দোলন, দেশে-বিদেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন ('অরন্ধন', 'বন্দেমাতরম্', ধ্বনিসহকারে গঙ্গাস্নান, 'রাখীবন্ধন' ইত্যাকার বিষয় স্মর্তব্য) আর 'সশস্ত্র বিপ্লববাদী' আন্দোলনে 'হিন্দুধর্মভিত্তিক কর্মপন্থা' থাকার ফলে এইসব আন্দোলন মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে নি। এটি অবশ্যই বিশ্লেষণযোগ্য বিষয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদের সমার্থক। তাঁরা 'আর্য আদর্শ' দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। বহু চরমপন্থী জাতীয়তাবাদকে হিন্দু পুনরুত্থানের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং জাতীয়তাবাদকে ধর্ম হিসেবেই মনে করেন। অরবিন্দ ঘোষ ভবানী বা শক্তিমাতার আরাধনা করে মৃত্যুভয় অগ্রাহ্য করার পরামর্শ দিতেন। এঁদের কাছে এই দেশ ছিল 'ভবানীভারতী' বা 'ভারতমাতা'। 'হিন্দু সিমবলস', 'থীমস', 'ইতিয়মস' মুসলমানদের ভীত করে তোলে। স্বভাবতই এই আন্দোলনের সঙ্গে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে গান্ধীজীর ভূমিকা অনস্বীকার্য; কিন্তু 'রামরাজত্বের' প্রতি তাঁর অধ্যাত্মিক ঝোঁক জাতীয় সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছিল, এটিও স্বীকার্য। খোলাখুলি বলা দরকার, পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতাবর্গ জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর আলোচনা আর মূল্যায়নে চিরাচরিত-রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চালিত হয়েছেন। উপরন্তু স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিভিন্ন জাতিসত্তার ভূমিকাটি অনিরূপিত থেকে গেছে। বিশেষ-সম্প্রদায়ভুক্ত এক উচ্চ-শ্রেণীর ভূমিকা আর আবেদনের কথাই যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হয়েছে। এটি কাম্য ছিল না। এই বিষয়ে পর্ষদের নির্দেশ যথেষ্ট পরিষ্কার নয়।

স্যার সৈয়দ আহমদ ও আলিগড় আন্দোলন

ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে সংস্কার আন্দোলনে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর কার্যকরী ভূমিকা পাঠ্যপুস্তক-সমূহে আলোচিত হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার ও একজন সমাজ-সংস্কারক হিসেবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

জনৈক ঐতিহাসিকের মতে, রামমোহন রায়কে যদি হিন্দুসমাজের অগ্রগতির অগ্রদূত বলা যায়, তাহলে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ ছিলেন ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের নবজীবনদাতা। ১৮৭৫-এ আলিগড়ে 'মহমেডান অ্যাংলো-ওরিয়েনটাল কলেজ' স্থাপনের জন্য সৈয়দ আহমদ হিন্দু-মুসলিমনির্বিশেষে সকলের কাছ থেকে অর্থসাহায্য লাভ করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে মুসলিম সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নতির জন্য যে আন্দোলনটি তিনি পরিচালনা করেছিলেন, তা আধুনিক ইতিহাসে "আলিগড় আন্দোলন" নামে পরিচিত। রাজনৈতিক মতাদর্শে কংগ্রেসবিরোধী হিন্দু ও মুসলিম নেতাদের একই মঞ্চে সমবেত করে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ব্রিটিশ পার্লামেনটে পেশ করার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। তিনি সব ধর্মের মূলগত ঐক্যে বিশ্বাস করতেন। তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি আমরা উদ্ধৃত করতে পারি, 'হিন্দু ও মুসলমান সুন্দরী ভারতের দুইটি চক্ষুর ন্যায়; একটি আঘাত পাইলে অপরটি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।' কিন্তু তিনি কোনো-ক্রমেই প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনে আগ্রহী ছিলেন না, কেননা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপিত হলে মুসলিম স্বার্থ পুরোপুরি উপেক্ষিত হবে। তাঁর এই রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য প্রায় প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা তাঁকে 'দ্বিজাতি-তত্ত্বে'র উদ্ভাবক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। "ভারতের ইতিবৃত্ত" নামক একটি পাঠ্যপুস্তকে অবশ্য বলা হয়েছে, কোনো-কোনো সূত্র থেকে স্যার সৈয়দ আহম্মদের বিরুদ্ধে যে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনা হয়েছে আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকে তা মানতে রাজি নন।

মুসলিম রাজনীতির ধারা

ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও মুসলিম রাজনীতির ধারা [১৯২০-৩৪) [পর্যদ এ প্রসঙ্গে একটি অধ্যায় বরাদ্দ করেছে এবং পরবর্তী কালে লাহোর প্রস্তাব ও পাকিস্তান গঠনের পটভূমি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা রয়েছে। গ্রন্থরচয়িতারা মুসলিম রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা আর বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রসঙ্গটিকে জোরেশোরে তুলে ধরেছেন। এর থেকে ছাত্রমনে এই ধারণা বদ্ধমূল হবে যে ভারতীয় মুসলমানরা মুক্তি-সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এবং দেশ-ভাগ তারই অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু কী ধরনের সমাজ-আর্থ ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুসলিম রাজনীতির গতিধারা এমন রূপ লাভ করেছিল, তার ব্যাখ্যা ছাত্রদের সামনে তুলে ধরা হয় নি। কিংবা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করা হয়েছে এমন একটি পাঠ্যপুস্তক থেকে একটি উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে, 'মহম্মদ আলি জিন্না যখন সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে মুসলিম রাজনীতি গড়ে তুলতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় খ্যাতনামা মুসলিম উর্দু কবি ও দার্শনিক স্যার মহম্মদ ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮) ইসলামের আদর্শের ভিত্তিতে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে মুসলিম লীগের অধিবেশনে তিনি ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিম জাতীয়তাবাদ গঠনের কথা ঘোষণা করেন।' 'মহম্মদ ইকবাল···তাঁর কবিতার মাধ্যমে মুসলিম ও হিন্দু যুব-সমাজে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতো ইকবালও বিরামহীন কর্মের কথা প্রচার করেন। গতিশীল মনোভাব নিয়ে, বিশ্বকে পরিবর্তন করার ওপর তিনি সবিশেষ গুরুত্ব দেন। বাইরে তিনি ছিলেন মানবতাবাদী। কোনো ধর্মীয় ও সামাজিক তত্ত্বকে বিচারবিশ্লেষণ না করে গ্রহণ করাকে তিনি পাপ বলে মনে করতেন। প্রথম জীবনে তিনি দেশ-প্রেমের বাণী প্রচার করেন, কিন্তু ক্রমে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবল সমর্থক হয়ে ওঠেন।' ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি ভারতীয় মুসলিম রাজনীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ আলি জিন্না মুসলিম লীগের সভাপতি পদে

নির্বাচিত হন। এখানে মনে রাখা দরকার যে, রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্যায়ে জিন্না জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের এক প্রবল প্রবক্তা। কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি সাম্প্রদায়িক নেতা হিসাবে ভারতের রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন।' বাস্তবে মানবতাবাদী, ধর্মীয় গোঁড়ামি মুক্ত দেশপ্রেমী (স্মর্তব্য, "সারে জহাঁসে অচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হমারা ··") ইকবাল আর তুখোড় জাতীয়তাবাদী, হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রবলতম প্রবক্তা জিন্না মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবল সমর্থক হয়ে উঠলেন কেন, তার ব্যাখ্যা কি জরুরি ছিল না? আসতে বৃহদংশের মঙ্গলকে সামগ্রিক মঙ্গল হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং ধর্মের বিচারে সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের প্রতি তাচ্ছিল্য আর অনীহা তাঁদের এই পথে নিয়ে এসেছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মারফত ভীতি আর সন্ত্রাস সৃষ্টি করে জিন্না 'পাকিস্তান' অর্জন করেন নি। এই বিষয়ে অন্তহীন নতুন গবেষণা বহু ভুল ধারণাকে উৎখাত করে দিয়েছে। 'দ্বিজাতি-তত্ত্বের' সমর্থক শুধুমাত্র জিন্না নন, ১৯৩৭ সালে সাভারকারও ঘোষণা করেছিলেন, 'এদেশে প্রধানত দুটি জাতি হিন্দু ও মুসলমান।' সাভারকারের 'হিন্দু-রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার প্রচার মুসলমানদের শঙ্কিত করে তোলে। গান্ধীজীও চাইছিলেন 'রাজনীতির অধ্যাত্মী-করণ'। অদ্বিতীয় রণকৌশলনির্ধারক ব্যক্তিত্ব জিন্না এই সুযোগে নিজেকে 'ইসলামের সেবক' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইসব তথ্য নয়া প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরা দরকার। [দেখুন, জিন্নাচর্চা : নয়া ভাবনা, "চতুরঙ্গ", নভেম্বর, ১৯৮৮]।

কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন

ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় শিল্পপতিদের তৎপরতা, ভারতের রেলব্যবস্থা পত্তনের ফলাফল, অর্থনীতি সংক্রান্ত নতুন নীতি, আধুনিক শিল্পে ভারতীয় উদ্যোগহীনতার কারণ এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পরবর্তী সময়ে দেশীয় উদ্যোগের নতুন সুযোগ এলেও এদেশে শিল্পবিপ্লবের অনুপস্থিতি ইত্যাকার বিষয় আলোচনায় পাঠ্যপুস্তকরচয়িতারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় রেখেছেন। ১৮৫৮-১৮৬৫ পর্বের কৃষক অসন্তোষ, নীল বিদ্রোহ, দাক্ষিণাত্যের কৃষকবিদ্রোহ সংক্রান্ত আলোচনাটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। তবে ১৯২০-১৯৩৬ পর্বে কৃষক আন্দোলনের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ জরুরি ছিল। মালাবারের 'মোপলাবিদ্রোহ' (১৯২১)-কে ধর্মান্ধ মুসলমানদের আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন জনৈক বর্ষীয়ান পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা। এই প্রসঙ্গে বিপ্লবী এম. এন. রায়ের মূল্যায়নটি স্মর্তব্য : 'মোপলারা খুবই দরিদ্র। কৃষিই তাদের প্রধান জীবিকা। তারা সব সময় মহাজনদের হাতে নিপীড়িত হয়েছে যে মহাজনরা হল হিন্দু। দেশের ঐ বৃহৎ অঞ্চলের বৃহৎ ভূস্বামীদের অধিকাংশও হল হিন্দু। এই ··বিদ্রোহ হল সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কারণে।' (M. N. Roy, India in Transition, p. 88)। এই পর্বে ব্রিটিশ শাসক-গোষ্ঠীর সহযোগী জমিদারশ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকসমাজ বারেবারে বিদ্রোহ করেছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছে কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি ব্যাপক কোনো আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে নি। কৃষকসমাজের সমস্যার প্রতিও দৃষ্টি দেয় নি। বস্তুত সমাজতন্ত্রবাদীরা ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে 'অল ইনডিয়া কিষাণসভা' প্রতিষ্ঠার মারফত কৃষকসমাজকে জাতীয় আন্দোলনের শরিক করে তোলে। স্বীকার্য যে দুএকটি পাঠ্যপুস্তক বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে। '১৯২০ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত ভারতের শ্রমিক আন্দোলন' সম্পর্কিত অধ্যায়টি পাঠ্য-গ্রন্থে চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বিপানচন্দ্রের মতে, 'ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতারা ব্রিটিশ পুঁজি-পতিদের ক্ষেত্রে শ্রমিক-দরদী ও ভারতীয় পুঁজিপতি-দের ক্ষেত্রে শ্রমিক-বিরোধী এই পরস্পরবিরোধী

ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।' গান্ধীজী শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি এটিও জানতেন যে জওহরলাল নেহরুও শেষ পর্যন্ত শ্রেণীসংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন না। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনগুলোতে কমিউনিস্টপার্টির অবদানের বিষয়টি স্বীকৃত হয়েছে। এই সুবাদেই এম. এন. রায়, পি. সি. যোশী, এস. এ. ডাঙ্গে, মুজফ্‌ফর আহমদ, গোলাম হোসেন (লাহোর), এস. এস. সিরাজকার, শওকত ওসমানী, নলিনী গুপ্ত প্রমুখের নাম ইতিহাসের পাতায় উঠে এসেছে।

স্বাধীনতাসংগ্রামের শেষপর্বে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা এইভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তিনি ভারত তথা এশিয়ার মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে রচনা করেছিলেন সম্ভাবনাপূর্ণ এক নতুন অধ্যায়।

তথ্যগত ত্রুটি

আলোচনাশেষে সংশোধনযোগ্য দুটো তথ্যগত ত্রুটির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। ড. নিমাইসাধন বসু প্রণীত 'ভারত ইতিহাসের ধারা' নামক গ্রন্থে লেখা হয়েছে, 'এশিয়া মহাদেশের পশ্চিমে আরবের মক্কা নগরীতে পয়গম্বর হজরত মহম্মদের জন্ম হয় ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের কোনো এক সময়ে।' (পৃ ৯৯)। ইংরিজি ক্যালেণ্ডারে জন্মসাল ও তারিখ হল ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল। এটি তর্কাতীত সত্য। 'কোনো এক সময়ে'—এইরকম সন্দেহের কোনো ঐতিহাসিক কারণ নেই। 'ভারতের ইতিবৃত্ত' (কল্যাণ চৌধুরী) নামক গ্রন্থে মওলানা আবুল কালাম আজাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তিনি কায়রোতে অবস্থিত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-সমাপ্তির পরে স্থায়িভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে চলে আসেন।' (পৃ ১৪৬)। বস্তুত মওলানা আজাদ কস্মিনকালেও আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন না। (দেখুন, "ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রীডম', পৃ ৬, জানুয়ারি ১৯৫৯)। অসাধারণ এই গ্রন্থটি বেরুবার এত বছর বাদে এই ধরনের ভুল কাম্য নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. অমলেশ ত্রিপাঠী একটি বহুলপ্রচলিত সাপ্তাহিকে "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস" নামক ধারাবাহিক রচনায় একই ভুল করেছেন। বিস্ময়ের কথা, সূত্র হিসেবে তিনি 'ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রীডম'-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

উপসংহার

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যেতে পারে যে, ভারতের ইতিহাস আলোচনায় পাঠ্য-পুস্তক প্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি দুটি ধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, ১. রক্ষণশীল বা সনাতনবাদী ধারা, ২. আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ধারা। স্পর্শকাতর বিষয়গুলোতে সনাতনবাদী ধারা কিঞ্চিৎ প্রাধান্য পেয়েছে। কিছু-কিছু ক্ষেত্রে রক্ষণশীল আর আধুনিক ধারার সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে সিদ্ধান্তে বৈপরীত্য এসেছে। ফলত, শিক্ষার্থীদের জটিলতায় ভোগার সম্ভাবনা পুরোদস্তুর রয়েছে। আশা করা যেতে পারে, আগামীতে পাঠ্য-পুস্তকের পরিমার্জিত সংস্করণগুলো দুর্বলতামুক্ত হয়ে উঠবে। এই প্রসঙ্গে এটিও ভেবে রাখা জরুরি যে ভারতীয় ইতিহাসের নির্মোহ মূল্যায়ন ব্যতিরেকে জাতীয় জীবনে সম্প্রতি ও সংহতি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাও অলীক কল্পনায় পর্যবসিত হবে।

বিশ্বসাহিত্য

উলকি

তানিজাকি জুনিচিরো

অনুবাদ : সুপ্রিয়া দাশগুপ্ত

এই ঘটনাগুলো ঘটেছে সেই স্বর্ণযুগে, যখন চাপল্য, রঙ্গরস এক উন্নত ধরনের শিল্প বলে সমাদৃত হত। সে যুগে তখন একালের জীবনধারণের নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বও ছিল না। নীলরক্ত যুবক এবং জমিদার-পুত্রদের প্রফুল্ল আনন সর্বদাই নির্মেঘ ছিল। রাজদরবারে সম্ভ্রান্ত যুবতী আর বিখ্যাত গণিকাদের মুখে ছিল অম্লান হাসি। চা-খানার পেশাদার ভাঁড়দের রঙ্গকৌতুক যোগানোর কাজকে বেশ সম্মানের চক্ষেই দেখা হত। জীবনটা ছিল শান্ত। আনন্দের খোরাক ছিল প্রচুর। সে যুগের রঙ্গমঞ্চে, এমনকী সাহিত্যেও, সৌন্দর্যের সঙ্গে শক্তির সংযোগ অবিচ্ছেদ্যভাবে দেখানো হত। দৈহিক সৌন্দর্য জীবনের অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে ধরা হত তখন। দেহের সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য লোকে নিজের শরীর উলকি দিয়ে চর্চিত করার চরম পদ্ধতি ব্যবহার করত। তখনকার মানুষের শরীরে বর্ণাঢ্য সূক্ষ্ম রেখাচিত্র নাচের ছন্দে উন্মোচিত হত। গণিকালয়ে যাবার জন্য সেকালের বিত্তবানেরা এমন সব পালকি-বেহারাদের বেছে নিতেন যাদের শরীর সুদৃশ্য উলকিতে চিত্রিত। যোসিওয়ারা আর তাতসুমির বারবধূরা কেবল সেইসব গর্বিত পুরুষদেরই বাহুবন্ধনে ধরা দিত যাদের শরীর সুচারু উলকিতে কারুকার্য করা। সামান্য কর্মচারী থেকে বণিক, জুয়াড়ি, এমনকী সামুরাইরা পর্যন্ত এই উলকির কারুকার্যের সাহায্য নিতে পিছপা হতেন না। প্রায়ই উলকির প্রদর্শনী হত। যাঁরা এতে যোগ দিতেন, তাঁরা পরস্পরের শরীরে আঁকা উলকি-চিহ্ন স্পর্শ করে নকশার নিন্দা অথবা প্রশংসা করতেন।

সে সময়ে অসামান্য প্রতিভাবান এক যুবক উলকিকার ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে নিজের শরীরে উলকি নেওয়া বিলক্ষণ কেতাদুরস্ত চালিয়াতির ব্যাপার ছিল। তাঁর খ্যাতি পুরানো গুণী উলকিকার, যেমন 'আসাকুমা', 'চরিবানি' অথবা মাতসুমাতোর 'ইয়াকোহেই', এদের সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর শিল্পকলা যে-কোনো উলকি প্রদর্শনীতে বিশেষ সম্মানিত হত। কারুকার 'দারুসাকিন' তাঁর সূক্ষ্ম অঙ্কনপদ্ধতির জন্য সুখ্যাত ছিলেন এবং 'কারাকুমা যোশিবা' বিখ্যাত ছিলেন তাঁর সিঁদুরে উলকির জন্য। এই যুবক সেইকিচি তাঁর কারুকার্যের অভিনবত্ব এবং ইন্দ্রিয়চেতনার জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন।

সেইকিচি পূর্বে 'টয়কুনি' এবং 'কুমিসাড়া' ঘরানার শিল্পী হিসাবে সেই রীতি অনুসারে ছবি এঁকে নাম করেছিলেন। শিল্পী থেকে উলকিকার হওয়া—এক ধাপ নেমে আসা। তা সত্ত্বেও তিনি সত্য-সত্যই শিল্পী মেজাজের স্পর্শকাতরতা অটুট রেখেছিলেন। যাঁদের গায়ের চামড়া আর শরীরের গড়ন তাঁর পছন্দ হত না তিনি কখনো সেইসব লোকেদের শরীরে উলকি আঁকতে রাজি হতেন না। যেসব মক্কেলদের তাঁর কাছে আসবার সৌভাগ্য হত, তাঁরা সম্পূর্ণভাবে সেইকিচির নিজের পছন্দমতো উলকি নিতে বাধ্য হতেন। তা ছাড়া, তাঁদের মাসাধিক কাল তাঁর ছুঁচের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হত।

এই নবীন উলকি-আঁকিয়ের মনের গভীরে ছিল বিস্ময়কর কামনা-চরিতার্থতার উত্তেজনা। তাঁর ছুঁচের খোঁচায় তাঁর মক্কেলদের শরীর ফুলে উঠে গাঢ় লাল রঙ চুঁয়ে-চুঁয়ে পড়ত, আর বেচারিরা যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আর্তনাদ করে উঠতেন। যতই তাঁদের আর্তনাদ বেড়ে যেত, শিল্পীর মন ততই এক অদ্ভুত উল্লাসে ভরে উঠত। তিনি সিঁদুরে-রঙ উলকি করতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করতেন। কারণ এই সিঁদুরে-উলকি শরীরে আঁকা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। তাঁর মক্কেলরা পাঁচশ থেকে সাতশ ছুঁচের খোঁচা শরীরে নিয়ে উলকির রঙের ঔজ্জ্বল্য বাড়াবার জন্য ফুটন্ত জলে স্নান করে প্রায়শই তাঁর পায়ের কাছে অর্ধমূর্ছিত হয়ে পড়তেন। সেইকিচি তখন তৃপ্ত হাসি হেসে বলতেন, 'উলকি তাহলে বেশ যন্ত্রণা দেয়, কী বলেন?'

যখন কোনো ভীতু খদ্দেরের দাঁতে-দাঁত লেগে যেত, অথবা সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠত, সেইকিচি বলে উঠতেন, 'আমি সত্যিই ভাবছিলাম আপনি কিয়োটোর অধিবাসী, কারণ তারা সাহসের জন্য বিখ্যাত। একটু ধৈর্য ধারণ করুন, আমার ছুঁচের খোঁচা ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক।' তারপর চোখের কোণ দিয়ে সেই চোখের জলে ভেজা মুখের দিকে চেয়ে নিরুদ্বিগ্ন মনে নিজের কাজ করে যেতেন। আর যদি তাঁর মক্কেল এই সুতীব্র যন্ত্রণায় অবিচলিত থাকতেন, তবে তিনি বলে উঠতেন, 'ওঃ, আপনার চেহারা যা বলে তার চেয়ে আপনি তো দেখছি অনেক সাহসী। আচ্ছা, একটু অপেক্ষা করুন, এরপর যা তীব্র যন্ত্রণা শুরু হবে, তা আপনি নীরবে সহ্য করতে পারবেনই না।' তারপর তিনি তাঁর সাদা দাঁত দেখিয়ে হেসে উঠতেন।

বহু বছর ধরে সেইকিচির মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তাঁর নিপুণ ছুঁচের মুখে যেন এক পরমা সুন্দরী কন্যার উজ্জ্বল কমনীয় দেহ উন্মোচিত হয়। তাঁর এই মানসী নারীকে বহু গুণের অধিকারী হতে হবে। কেবল সুন্দর মুখ আর মসৃণ চামড়া হলেই চলবে না। তিনি বৃথাই রূপোপজীবিনী মহলে তাঁর মানসীকে খুঁজে এসেছেন। এই মানসী-প্রতিমা তাঁর মনে সর্বদাই জাগ্রত রয়েছে। সেইকিচির এই অন্বেষণ গত তিন বছর ধরে চলেছে। তাঁর আকাঙ্ক্ষার উন্মত্ততা দিনে-দিনে বেড়েই চলেছে। একদিন গ্রীষ্ম-সন্ধ্যায় ফুকাগাওয়া প্রদেশে পায়ে হেঁটে বেড়াতে-বেড়াতে তিনি দেখলেন—শ্বেতমর্মরের মতো উজ্জ্বল, মসৃণ, শুভ্র পদযুগল পালকির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। মুখের মতো পা-ও অনেক ভাব ব্যক্ত করতে পারে, এবং সেই সুগোল পদযুগল সেইকিচির কাছে মহার্ঘ্য রত্নের মতো মনে হল। কন্যার অপরূপ গড়নের পায়ের আঙুল, বর্ণ-বিকাশী নখশোভা, সুগোল গোড়ালি আর ত্বক এমনি ভাস্বর, যেন মনে হয় কতকাল এক স্বচ্ছ পাহাড়ি নদীর জলে ধৌত হয়ে এসেছে। এইসব মিলিয়ে সেই নিখুঁত সৌন্দর্যময় পা-দুখানি সৃষ্টি হয়েছে যেন পুরুষের হৃদয়কে চঞ্চল অস্থির ক'রে, সেই হৃদয় নির্মমভাবে পদদলিত করে যাবার জন্যই।

সেইকিচি সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলেন—এই-ই তাঁর মানসী রমণী, যাঁকে তিনি এতকাল ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আনন্দিত মনে তিনি সেই পালকিটিকে অনুসরণ করলেন—যদি এক লহমার জন্যেও পালকি আরোহিণীর মুখখানি দেখা যায়। বেশ কয়েকটি অলিগলি পালকির পিছন-পিছন চললেন। এরপর এক মোড় নেবার সময় পালকিটি আর খুঁজে পেলেন না। এরপর থেকেই সেইকিচির মনের সেই অস্পষ্ট কামনা পরিণত হল তীব্র আসঙ্গলিপ্সায়।

দীর্ঘ এক বছর পরে ফুকাগাওয়া প্রদেশে সেইকিচির বাড়িতে এক আগন্তুক এলেন। তিনি বললেন,

সেইকিচির এক বান্ধবী, তাতসুমি অঞ্চলের এক গেইসা তাকে পাঠিয়েছেন। ভীরুস্বরে মেয়েটি বলল, 'মহাশয়, আমার কর্ত্রীঠাকুরানি নিজহাতে আপনাকে এই অঙ্গবস্ত্র দিতে আজ্ঞা করেছেন। তাঁর অনুরোধ —আপনি যেন দয়া করে বস্ত্রটির আস্তরণে নকশা এঁকে দেন।' মেয়েটি তারপর সেইকিচির হাতে একটি চিঠি এবং একখানি রমণীয় পরিধেয় বস্ত্র দিল। পোশাকটি অভিনেতা ইওয়াই টোজাকুর ছবি-আঁকা কাগজে জড়ানো ছিল। চিঠিতে সেইকিচির বান্ধবী জানিয়েছেন—তরুণীটি তাঁর পালতা। এই প্রথম রাজধানীর চা-খানার গেইসা রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। সেইকিচি যেন তরুণীকে যথাসাধ্য সাহায্য করে।

সেইকিচি মেয়েটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণ করলেন। যদিও মেয়েটি বয়সে ষোড়শী কি সপ্তদশী হবে, কিন্তু তার মুখে যেন আশ্চর্য পরিপূর্ণতার ঐশ্বর্য। তাঁর চোখে সব সৌন্দর্যবান পুরুষের আর সব রূপবতী নারীর অলক্ষ্য স্বপ্নের ছায়া। এইসব পুরুষ বা নারী যে নগরে বাস করে, সেখানে পাপপুণ্য একাকার হয়ে একই লক্ষ্যবিন্দুর উদ্দেশ্যে চলেছে। তারপর সেইকিচির দৃষ্টি পড়ল কন্যার কোমল সুষম পা দুখানির দিকে, যা এখন সুদৃশ্য খড়ের পাদুকায় মোড়া।

সেইকিচি বিস্ময়ে বললেন, 'তুমিই কি গত বছর "হিরাসেই" চা-খানা থেকে পালকি করে ফিরছিলে?'

মেয়েটি এই অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তরে হেসে বলে, 'হ্যাঁ, আমিই সেই মেয়ে। তখন আমার বাবা বেঁচে ছিলেন। তিনিই আমাকে মাঝে-মাঝে "হিরাসেই" চা-খানায় নিয়ে যেতেন।'

সেইকিচি বললেন, 'আমি তোমার জন্য পাঁচবছর অপেক্ষা করছি। এই প্রথম আমি তোমার মুখ দেখলাম। কিন্তু তোমার পা দুখানি আমি চিনি। একটা জিনিস আমি তোমাকে দেখাতে চাই, দয়া করে ভেতরে এসো, ভয় পেয়ো না।' এই বলে তিনি অনিচ্ছুক তরুণীর হাত ধরে তাকে দোতলার এক ঘরে নিয়ে এলেন। সেই ঘর থেকে বিশাল নদী দেখা যায়। সেইকিচি দুখানি গোটানো পট এনে একখানি মেয়েটির সামনে খুলে ধরলেন।

ছবিখানি হচ্ছে অতীত যুগের চীনে সম্রাট 'নিষ্ঠুর চৌ'-এর প্রিয়তমা মহিষীর চিত্র। অলস ভঙ্গিমায় রানী 'মেসি' সিঁড়ির থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নীচে বাগানের-দিকে-নেমে-যাওয়া সিঁড়ির ধাপে-ধাপে তাঁর জমকালো কিংখাব ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর ছোটো মাথাটি গাঢ় নীল পাথর আর প্রবালখচিত মুকুটের ভার সইবার পক্ষে অতি সুকুমার। তাঁর ডান হাতে ঈষৎ নোয়ানো পেয়ালা, তিনি আলস্যভরে নীচের বাগানে আনীত এক বন্দীকে লক্ষ করছেন। খুঁটির সঙ্গে হাত-পা শক্ত করে বাঁধা কয়েদির চোখ বোজা, মাথা নত। এই দৃশ্যের চিত্র সাধারণত অমার্জিত আর অসংস্কৃতই হয়। কিন্তু এখানে রাজমহিষী এবং হতভাগ্য বধ্যের মনোভাব এত কৌশলে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে এই চিত্র অপরূপ এবং পরিপূর্ণ।

মেয়েটি স্থিরদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ এই অদ্ভুত চিত্রটির দিকে তাকিয়ে রইল। তরুণীর চেহারায় ধীরে-ধীরে সেই অতীত যুগের চীনের রাজরানীর সাদৃশ্য ফুটে উঠল।

মেয়েটি তার ম্লান কপোলে হাত রেখে বলল, 'কেন আপনি আমাকে এই বীভৎস চিত্র দেখালেন?'

সেইকিচি বললেন, 'ছবিতে যে রমণীকে আঁকা হয়েছে, সে তুমিই। তারই রক্ত তোমার ধমনীতে প্রবাহিত।'

তিনি তখন আরো একটি গোটানো চিত্র খুলে ধরলেন। এই চিত্রের নাম "বলি"। ছবির মধ্য-

দেশে চেরিগাছে হেলান দিয়ে এক যুবতী, আর তার পায়ের নীচে কয়েকটি পুরুষের শবদেহ পড়ে আছে। মেয়েটির রক্তহীন শ্বেত-আননে অহংকার এবং তৃপ্তির বিচিত্র সমন্বয়। শায়িত শবদেহগুলির উপর কয়েকটি ছোটো-ছোটো পাখি আনন্দে কিচমিচ করে খেলে বেড়াচ্ছে। বলা মুশকিল, শিল্পী ছবিতে কী দেখাতে চেয়েছেন—বসন্তের দিনের কুঞ্জকানন, না যুদ্ধক্ষেত্র? এই ছবির মেয়েটির সঙ্গে তাঁর অতিথির আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ করে সেইকিচি বললেন, 'এই তোমার ভবিষ্যতের প্রতীক। এই যে শায়িত পুরুষেরা, এরা তারাই—যারা তোমার জন্য প্রাণ দেবে।'

'দয়া করে চিত্রটি সরিয়ে ফেলুন'—সেই ভয়াল আকর্ষণের কাছ থেকে পালাবার জন্যই তরুণী পিছন ফিরে মাদুরের ওপর লুটিয়ে পড়ল। তার সমগ্র শরীর শিউরে-শিউরে উঠল। ঠোঁট কাঁপতে লাগল। সে বলল, 'আমি স্বীকার করছি—আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, আমার মনের গোপনে এই রমণীর স্বভাবই নিদ্রিত রয়েছে। আমার প্রতি দয়া করুন, চিত্রটিকে শীঘ্র সরিয়ে ফেলুন।' উলকিকার বলল, 'ভীরুর মতো কথা বোলো না, বরং চিত্রটি তুমি ভালো করে নিরীক্ষণ করো। আরো যত্নসহকারে দেখো, তাহলে তুমি আর ভয় পাবে না।'

তরুণী কিন্তু কিছুতেই তার কিমনোর আস্তিনে ঢাকা মুখ খুলতে পারে না। সে মাটিতে মাদুরের ওপর লম্বা হয়ে শুয়েই রইল। আর বার-বার বলতে লাগল, 'আমায় বাড়ি ফিরে যেতে অনুমতি দিন, আপনার সান্নিধ্যে থাকতে আমার ভয় করছে।'

সেইকিচি রাজকীয় মেজাজে বললেন, 'তোমায় আরো কিছুক্ষণ থাকতে হবে। তোমাকে পরমা-সুন্দরী করবার ক্ষমতা আমারই হাতে।'

তারপর দেরাজের টানার ভেতর থেকে ওষুধের বোতল এবং ইনজেকশানের ছুঁচগুলোর মধ্য থেকে এক কড়া ঘুমের ওষুধ বেছে নিলেন।

নদীর ওপর সূর্য উজ্জ্বল হল আর রশ্মি সোনালি চেউয়ের মতো দরজার ওপর আর ঘুমন্ত তরুণীর মুখের ওপর খেলা করতে লাগল। সেইকিচি দরজা বন্ধ করে মেয়েটির পাশে বসলেন। এই প্রথম তিনি রমণীর আশ্চর্য সৌন্দর্যসুধা সম্পূর্ণ আস্বাদ করতে পারলেন। তাঁর মনে হল—তিনি বছরের পর বছর এই অচঞ্চল সৌন্দর্যপ্রতিমার নিখুঁত মুখখানি নিরীক্ষণ করতে পারেন।

কিন্তু অল্প সময় পার হতেই তাঁর প্রিয় নকশা শুরু করবার ইচ্ছা তাঁকে উত্তেজিত করে তুলল। সেইকিচি তাঁর উলকি আঁকবার সরঞ্জাম জড়ো করে তরুণীর দেহ-আচ্ছাদন মুক্ত করে তুলিকা নিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। ডান হাতে তীক্ষ্ণধার সূচিকা নিয়ে তিনি আঁকা নকশা ধরে ফুটিয়ে যেতে লাগলেন। একদা মেমফিসবাসীরা যেমন পিরামিড আর স্ফিংস নির্মাণ করে সৌন্দর্যময় মিশরকে আরো সুশোভিত করেছিলেন, সেইকিচিও তেমনি মেয়েটির চিকন শুভ্র ত্বক তাঁর উলকি-কারুকার্য দিয়ে আরো অলংকৃত করে তুলছিলেন।

উলকিকারের আত্মা যেন সুদৃশ্য নকশার ভেতর প্রবেশ করছিল। আর তাঁর রক্তসূচিকার প্রত্যেকটি ফোঁড় যেন সেইকিচির নিজের শরীরের বিন্দু-বিন্দু রক্ত—যা তরুণীর শরীরে প্রবেশ করছে।

তাঁর সময়জ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। দ্বিপ্রহর এল, গেল। ধীরে শান্ত বসন্তের দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা গাঢ় হল। সেইকিচির অক্লান্ত হাতখানি মেয়েটিকে একবারও না জাগিয়ে উলকির ফোঁড় তুলে যেতে লাগল। ক্রমে চাঁদ উঠল। তার স্বপ্নালু আলো বাড়ির ছাদে, নদীর ধারে বিস্তৃত হল। উলকির

অর্ধেকও এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। সেইকিচি কাজ থামিয়ে আলো জ্বালালেন, তারপর আবার ছুঁচ নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন।

এখন প্রত্যেকটি সূচিকামতো তাঁকে পরিশ্রম করতে হচ্ছে। আঁকিয়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন। যেন প্রতিটি সূচিকা তাঁকেই বিঁধছে। ধীরে-ধীরে এক বিরাট মাকড়শার প্রতিচ্ছবি দেখা গেল। প্রথম প্রভাতের আবছা আলো সেই ঘরে যখনি প্রবেশ করল, তখনি দানবীয় আকৃতির এক জন্তু আট পা নিয়ে মেয়েটির অনাবৃত পিঠে ফুটে উঠল।

বসন্তের রাত্রি প্রায় শেষ। এখনি নদীতে নৌকোর দাঁড়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মাছধরা নৌকোর পাল ভোরের হাওয়াতে ফুলে-ফুলে উঠছে। অবশেষে সেইকিচি তাঁর উলকির ছুঁচ সরিয়ে রাখলেন। একটু সরে দাঁড়িয়ে তিনি তরুণীর পিঠে উলকি-তোলা বিরাট মাদি মাকড়শার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাকিয়ে-তাকিয়ে উপলব্ধি করলেন—উলকির মধ্যেই তাঁর প্রাণনির্যাস। এই কাজ শেষ করবার পর সেইকিচি নিজের অন্তরে গভীর শূন্যতা অনুভব করলেন।

তিনি মৃদুস্বরে বললেন, 'তোমায় অসীম সৌন্দর্য দান করবার জন্য আমি আমার আত্মা এই উলকির মধ্যে সমর্পণ করেছি—জান! এখন থেকে সমগ্র জাপানে তোমার রূপের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার সাধ্য আর কোনো রমণীর থাকবে না। সংশয়, দ্বিধা আর তোমাকে স্পর্শ করবে না। সমস্ত পুরুষজাতি এবার তোমার বলি।'

মেয়েটি কি তাঁর কথা শুনতে পেল? মৃদু কাতরোক্তি শোনা গেল, তরুণীর শরীর নড়ে উঠল। ক্রমে-ক্রমে মেয়েটির জ্ঞান ফিরে আসছিল। তরুণী ঘন-ঘন নিঃশ্বাস নেবার সঙ্গে-সঙ্গে তার পিঠে আঁকা মাকড়শার পাগুলি যেন জীবন্ত হয়ে উঠছিল।

সেইকিচি বললেন, 'তোমার নিশ্চয় খুব কষ্ট হচ্ছে। কারণ মাকড়শাটি তোমাকে ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে বেঁধেছে।'

মেয়েটির চোখ আরো উন্মুক্ত হল। প্রথমে সে দৃষ্টিশূন্য, তারপর তার চোখের তারা জ্বলতে লাগল—সেইকিচি মুখের ওপর পড়া চাঁদের আলোর মতো।

মেয়েটি বলে, 'আমায় পিঠের উলকি দেখতে দিন, আপনি যদি আপনার আত্মা আমায় দিয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমি সৌন্দর্য লাভ করেছি।'

সে যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছে, অথচ তার স্বরে আত্মপ্রত্যয় আর শক্তির আভাস।

সেইকিচি অত্যন্ত উৎকণ্ঠাপূর্ণ স্বরে বললেন, 'উলকির রঙ আরো উজ্জ্বল করবার জন্য প্রথমে উত্তপ্ত জলে স্নান করে নাও। এ অতি বেদনাদায়ক, তবু সাহস করে করো।'

মেয়েটি বলল, 'সৌন্দর্য লাভ করবার জন্য আমি সব কিছুই সহ্য করতে পারি।'

মেয়েটি কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে সেইকিচিকে অনুসরণ করে স্নানের ঘরে প্রবেশ করল। ফুটন্ত জলে অবগাহন করে যন্ত্রণায় তার চোখ ছলছল করে ওঠে। সে আর্তনাদ করে বলে, 'ওঃ, কী জ্বালা! দয়া করে আপনি স্নানঘর ত্যাগ করে ওপরে চলে যান। আমি তৈরি হয়ে আপনার কাছে যাব। আমার যন্ত্রণার দর্শক আমি চাই না।'

গরম জলের টব থেকে নঠবার পর তরুণী নিজেকে তোয়ালে দিয়ে শুষ্ক করবার ক্ষমতাও আর থাকে না। তবু সে সেইকিচির সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে-আসা হাত সজোরে সরিয়ে দিয়ে মেঝের

ওপর গড়িয়ে পড়ে। যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করে, লম্বা চুল মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। তরুণীর পশ্চাতের দর্পণে তার বর্ণালি শুক্তির মতো পদনখের ছায়া পড়ছিল।

সেইকিচি ওপরে চলে গিয়ে মেয়েটির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে যখন তরুণী উপস্থিত হল, তখন সে সযত্নে পোশাক পরেছে। তার ভিজে চুল আঁচড়ানো, কাঁধের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। মেয়েটি কোমল ওষ্ঠ আর বঙ্কিম ভ্রূযুগল তার কঠিন যন্ত্রণার কোনো সাক্ষ্যই দিচ্ছে না। সে যখন নদীর দিকে তাকিয়ে রইল, তার চোখে তখন শীতল কঠিন দৃষ্টি জ্বলজ্বল করছিল। বয়সে তরুণী হলেও তার আকৃতিতে ফুটে উঠল—চা-খানার এক অভিজ্ঞ গণিকার ভাব, যে বহু পুরুষকে জয় করেছে জীবনে।

পূর্বদিনের ভীরু বালিকার এই পরিবর্তন সেইকিচি বিস্ময়ে অনুধাবন করলেন। তারপর তিনি পাশের ঘরে গিয়ে গোটানো চিত্র দুটি এনে বললেন—'আমি তোমায় এই ছবি দুটি দিলাম, উলকিও তোমার, আমি তোমায় দিলাম।'

মেয়েটি বলে, 'নমস্য, আমার মনে ভয়ের লেশমাত্র নেই, আর আপনিই আমার প্রথম বলি।'

এই বলে তরুণী ধারালো তলোয়ারের ফলার মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শিল্পীর দিকে তাকায়। এ সেই রাজরানী আর চেরিগাছে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো রমণীর দৃষ্টি। জয়ের আনন্দে সেইকিচি শিহরিত হন, বলেন, 'তোমার উলকি আমাকে দেখাও।'

একটিও কথা না বলে মেয়েটি ঘাড় কাত করে সম্মতি জানায়। তারপর ধীরে পোশাক খুলে ফেলে। সকালের সূর্য মেয়েটির পিঠে এসে পড়ে, তার সোনালি আলোয় বিরাট মাকড়শা আগুনের মতো জ্বলতে থাকে।

লেখকের পরিচয় : জুনিচিরো তানিজাকি ১৮৮৬ সালে জাপানে টোকিয়ো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানি সাহিত্যের স্নাতক ছিলেন। অল্প বয়সে তাঁর লেখায় বোদলেয়ার, তথা অসকার ওয়াইলড প্রমুখ ইউরোপীয় লেখকদের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

১৯২৩-এর ভূমিকম্পে যখন টোকিয়ো শহর প্রায় বিধ্বস্ত, তখন তিনি প্রাচীন জাপানি সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র কিয়োটো শহরে বাস করতে শুরু করেন। এই সময় থেকেই তাঁর লেখায় পরিবর্তন দেখা যায়। কিয়োটো শহরের পুরনো ঐতিহ্য তাঁকে মুগ্ধ করে; তিনি অতীতের জাপানি সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর মহৎ রচনাগুলি এই সময়েরই সৃষ্টি।

১৯৩০ সালে তাঁর সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশিত হয়,—তিনি মহৎ সাহিত্যের স্রষ্টা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯৪৯ সালে তাঁকে সাহিত্যে রাজকীয় পুরস্কার দেওয়া হয়।

অস্বাভাবিকতার প্রতি সর্বগ্রাসী দুর্নিবার আকর্ষণ প্রায়ই তাঁর চরিত্রগুলিকে মানসিক বিকারের দরজায় পৌঁছে দেয়।

দৃষ্টিহীন নায়ক নায়িকাদেরও তাঁর রচনায় বারে-বারে দেখতে পাওয়া যায়। মনে হয়, প্রেম এবং অন্ধকারের প্রতি তীব্র অনুভূতি তাঁর রচনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

"নিউ ইয়র্ক হেরালড ট্রিবিউন" পত্রিকায় তাঁর রচনা সম্বন্ধে বলা হয়েছিল : 'যদি কোনো জাপানি লেখক নোবেল পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হন, তবে তানিজাকি তা পাবার সবচাইতে উপযুক্ত।'

তানিজাকি অবশ্য নোবেল পুরস্কার পান নি। অপর এক সার্থক জাপানি সাহিত্যিক ইয়াসুনারি কাওয়াওতা এই সম্মান লাভ করেন।

অল্প কয়েক বছর আগে তানিজাকির মৃত্যু হয়েছে।

মতামত

১

আপনাদের অভিজাত পত্রিকার সাম্প্রতিক প্রচেষ্টাটি লেখক-পাঠক সকলেরই অভিনন্দনযোগ্য। ভাষা-প্রয়োগ সম্পর্কে সকলকেই সচেতন ক'রে দিচ্ছেন ছোট-ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা-সঙ্কট তুলে ধরে। ৪৯ বর্ষ ৯ম সংখ্যায় উদ্ধৃতিচিহ্নের ব্যবহার, বাঙলা বাংলা, সঙ্গে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এইরকম আরও কটির কথাই আপনাদের জানাই।

ও এবং আর, বা অথবা কিংবা, কিন্তু, অথচ—এগুলির ব্যবহার সম্পর্কে সকলেরই একটি নীতির অনুসরণ করা উচিত। দুটি শব্দযোজক হিসেবে 'ও'-কার দুটি বাক্যযোজকরূপে 'এবং' নির্দিষ্ট হওয়া সমীচীন। যেমন—এই বনে বাঘ 'ও' শিয়াল থাকে। এই বনে বাঘ থাকে 'এবং' শিয়াল থাকে। দুইয়ের মাঝে 'ও' থাকবে; কারো গাঁ ঘেঁষে নয়, ছাড়াছাড়িভাবে। গাঁ ঘেঁষে 'ও' বসবে ইংরিজি অল্‌সো বা টু-র সমার্থক প্রয়োগের ক্ষেত্রে। যেমন—আমি যাব, তুমিও যাবে। কিন্তু 'আর' ও-এবং দুইয়ের বদলেই বসতে পারে। যেমন—এই বনে বাঘ আর শিয়াল থাকে। এই বনে বাঘ থাকে আর শিয়াল থাকে। এমনি 'বা' 'অথবা'-র প্রয়োগেও ভিন্নতা থাকা চাই। বিকল্প বোঝাতে সমার্থক শব্দদ্বয়ের মাঝে 'বা' এবং ভিন্নার্থক শব্দদ্বয়ের মাঝে 'অথবা' ব্যবহার করা দরকার। যথা—ধ্বাঙ্ক্ষ 'বা' কাক (ধ্বাঙ্ক্ষ অর্থাৎ কাক); গোরু 'অথবা' ঘোড়া (গোরু কিংবা ঘোড়া)। 'কিন্তু' 'অথচ'-র প্রয়োগেও শৈথিল্য দেখা যায়। কাঁচা কিন্তু মিঠা। এস্থলে কাঁচা 'অথচ' মিঠা লেখাই সমীচীন। 'অথচ' শব্দসংযোজক এবং 'কিন্তু' বাক্যসংযোজক গণ্য করাই উচিত। যেমন—কাঁচামিঠা আম কাঁচা খেতে ভালো; 'কিন্তু' পাকা খেতে ভালো নয়।

খবরের কাগজে দেখি স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্মৃতি উদ্দেশ্যে, অসবর্ণ বিবাহ অসবর্ণ বিবাহ। কোন্‌টা ঠিক? 'স্মৃতির উদ্দেশে' সঠিক প্রয়োগ। তু বাহিরায় যবে নদী সাগর উদ্দেশে। বর্ণ যখন জাতি অর্থাৎ স্পিসিজ তখন বানান সবর্ণ। যেমন বিড়াল বাঘের সবর্ণ। চতুর্বর্ণের এক বর্ণ অন্তর্গত যারা তারা পরস্পর সবর্ণ। কিন্তু সঙ্কর বর্ণের ক্ষেত্রে কী হবে? বর্ণ তখন জাত অর্থাৎ কাস্ট বোঝায়। সে ক্ষেত্রে বানান স্ববর্ণ (স্বজাতি) হওয়া উচিত। নেশন অর্থে জাতি ব্যবহার করলে স্বজাতির অর্থ কমপ্যাট্রিয়ট বোঝাবে।

এই মুহূর্তে স্মৃতির ওপর নির্ভর করে এই তালিকা আর বাড়ানো গেল না।

পুনশ্চ :—অ্যাভিনউ না এভিনিউ। একারের দুই উচ্চারণ স্বীকৃত। তবে আর অবৈজ্ঞানিক অ্যা আশ্রয় করা কেন! ৎ ত দুটি স্থলে কেবল ত লেখাই উচিত। এতে করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বানান ভুলও এড়ানো যাবে। যেমন—উচিৎ। কোলকাতা না কলকাতা? কলিকাতায় কো নেই কাজেই কলকাতাই বাঞ্ছিত। এইরকম আরও কত—হলো হল। কি কী অনেকেই ঠিক প্রয়োগ করতে পারে না। দ্ব্যর্থকতার ক্ষেত্রেই কেবল এই ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখলে ভালো হয়। তুমি কি খেয়েছ? তুমি কী খেয়েছ? নিম্ন অর্থে নীচ শব্দর প্রয়োগ সংস্কৃতেই আছে (গীতা ৩।১১) তবে আর নিচ কেন?

বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
শিবপুর, নদীয়া

২

আপনার "চতুরঙ্গ"-পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯) প্রকাশিত অধ্যাপক সুনীল সেন মহাশয়ের রচিত "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়, ১৯৪৫-৪৭" প্রবন্ধখানি আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। লেখাটি বেশ ভালো লাগল এবং এটি পড়ে আমি উপকৃত হয়েছি। প্রবন্ধটি তথ্যসমৃদ্ধ। ভাষাও সরল আর সাবলীল। তিনি একজন ভালো প্রাবন্ধিক—তার পরিচয় পাওয়া যায় উক্ত প্রবন্ধে।

তাঁর এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে আমি সবিনয়ে দু-একটি সমালোচনামূলক কথা বলতে চাই।

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই ডঃ মজুমদারের একটি বাক্যের উদ্ধৃতি আছে কিন্তু তার রেফারেন্স নেই, থাকা উচিত ছিল। ডঃ মজুমদার 'History of the Freedom Movement of India' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন, ১৯৪৫-এর পর যেসব বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেছিল, তাই ই ব্রিটিশকে ভারত ত্যাগে বাধ্য করলো। এই "Post-war Revolution"-এর জন্য দায়ী সুভাষচন্দ্র ও আই. এন. এ.; স্পষ্টত, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৯৪৬-৪৭ অবধি চলেছিল। দেখা যাচ্ছে, এসব

কথার সঙ্গে অধ্যাপক সেনের উদ্ধৃত বাক্যটির সামঞ্জস্য হচ্ছে না।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে প্রবন্ধকার লিখেছেন : 'মনে হয়, ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের সঙ্গে-সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক অবস্থার যে মৌল পরিবর্তন ঘটেছিল, ভারতের গণজাগরণ তার অঙ্গ।' এই কথাটি অনেকেই মেনে নিতে পারবেন না. ইতিহাসের আলোকে দেখা যায়, ভারতে গণজাগরণের কারণ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ। শাহনওয়াজ, ধীলন ও সাইগলের বিচারকে কেন্দ্র করে ভারতে জনসাধারণের মধ্যে বিরাট উদ্দীপনা দেখা যায়,—দেখা যায় ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব। ছাত্র, শ্রমিক, পুলিশ ও সেনানীর মধ্যেও গভীর স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ দেখা দিল। এ সম্পর্কে প্রবন্ধকার পরে উল্লেখও করেন। সুতরাং উপরে উদ্ধৃত কথার সঙ্গে পরের ঘটনাগুলির যোগ কোথায়? এই দুইয়ের মধ্যে লজিকাল কনসিসটেনসি নেই বলে আমি মনে করছি।

তৃতীয় : 'সকল রাজনৈতিকদল এই আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছিল' (তৃতীয় অনুচ্ছেদ)।

কিন্তু আমার যতদূর স্মরণ হয়, কমিউনিস্ট পার্টি এতে ছিলেন না। স্বভাব বসু সম্পর্কে এই পার্টির যে ধারণা, তা প্রকাশ পেয়েছিল তাঁদের "জনযুদ্ধ" কাগজে। সে ধারণা ১৯৪৬ সালেও একই রূপ ছিল। আগস্ট আন্দোলনকে কমিউনিস্ট পার্টি স্বাগত তো জানান ই নি; অধিকন্তু, ব্রিটিশের সাথে হাত মিলিয়ে তাঁরা যে এই আন্দোলন দমনে সাহায্য করেছিলেন তা সবার জানা; এটি ঐতিহাসিক সত্য। কমিউনিস্ট বন্ধুরা সেদিন স্বদেশপ্রেম দেখাতে পারেন নি। ব্রিটিশের অনুকূলে কার্য করায় তাঁরা তখন দেশে 'traitor' বলে পরিচিত হয়েছিলেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও নেতাজীর কার্যকলাপ প্রকাশ পেলে কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন সেক্রেটারি পি. সি. যোশী মহাশয় যে বিবৃতি দেন তা দেশবাসী পছন্দ করেন নি, বরং এই বিবৃতির জন্য নিন্দিত হন। তাঁর বিবৃতিতে পরিষ্কার যে—সুভাষ বসু-গঠিত স্বাধীনতার সৈনিকদের অনুকূলে প্রচার করার প্রয়োজন বোধ করেন নি শ্রীযোশী মহাশয়।

আমার সমালোচনার মধ্যে ভুল থাকতে পারে। তা দেখিয়ে দিলে খুশি হব। মানুষ কেউ-ই নিখুঁত নন। সুতরাং ভুল-ত্রুটি মানুষের স্বাভাবিক।

হীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার
জগাছা, হাওড়া

৩

'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়' এর 'এক'-অংশে অধ্যাপক সুনীল সেন লিখেছেন, 'মহীয়সী মহিলা জ্যোতির্ময়ী ছাত্র-মিছিলের সঙ্গে যেতে-যেতে মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হন।'

ধর্মতলা স্ট্রীটে সেই ছাত্রমিছিলে সেদিন আমিও ছিলাম। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী ছাত্রমিছিলে ছিলেন না। তিনি মোটরে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে যাচ্ছিলেন। একটি মিলিটারি জিপের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে তিনি নিহত হন। সেদিনকার সেই দুর্ঘটনা ব্রিটিশ মিলিটারির ইচ্ছাকৃত ও মতলবপ্রসূত ছিল।

আশাকরি, চতুরঙ্গে এটা প্রকাশ করে পাঠকদের প্রকৃত ঘটনা জানার সুযোগ দেবেন।

সুশান্ত মজুমদার
বিরাটি, কলিকাতা